হারাধনের দ্বীপ

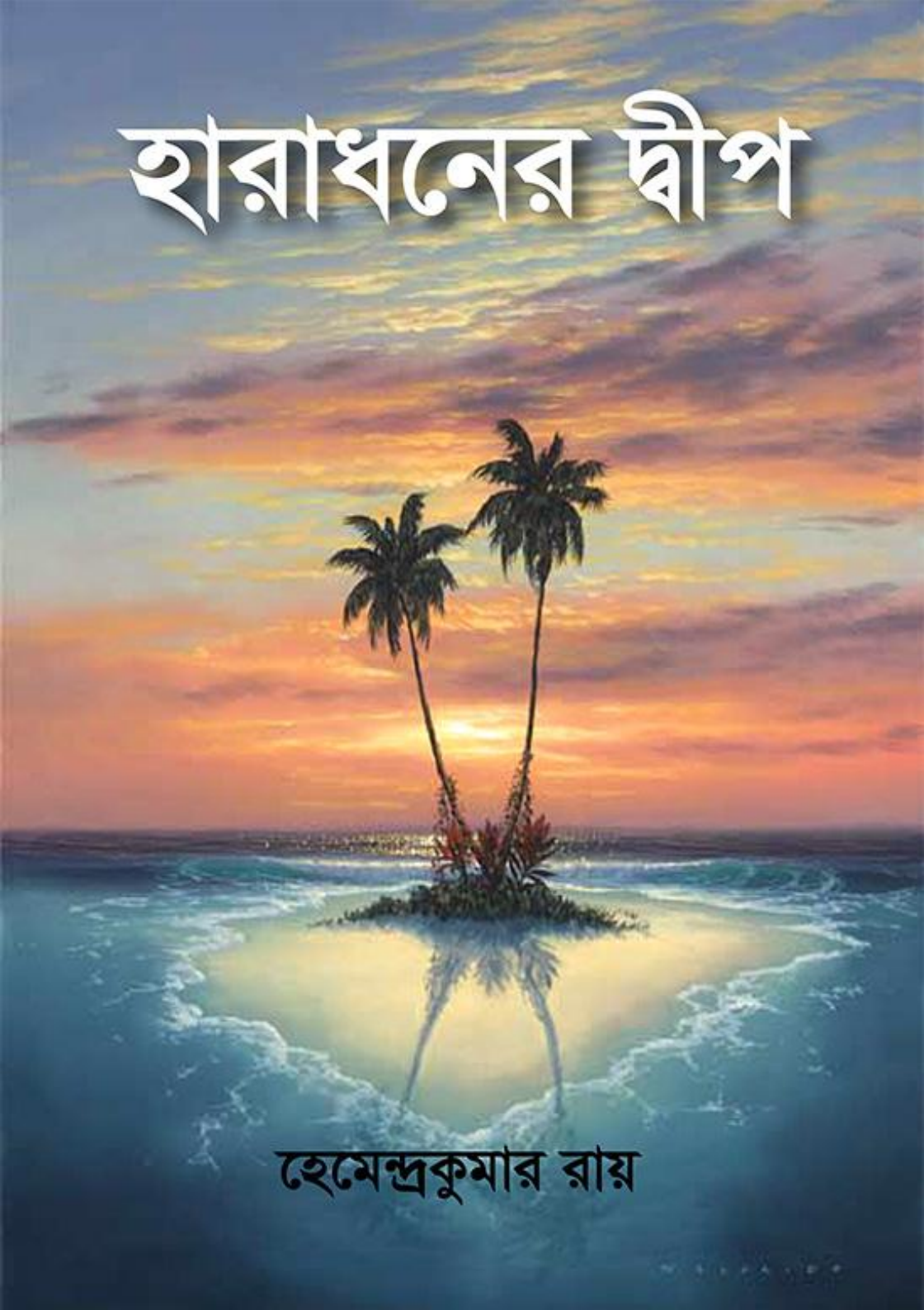

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হারাধনের দ্বীপ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

প্রচ্ছদের ছবি: নেট থেকে সংগ্রহীত

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরি। আগে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জজসাহেব, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। একখানি উচ্চ-শ্রেণির কামরায় চেপে ট্রেনে করে তিনি যাচ্ছিলেন পোর্ট ক্যানিং-এর দিকে। সিগার টানতে টানতে পড়ছিলেন একখানি খবরের কাগজ ।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে কামরার জানলা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সূর্যকরদীপ্ত নির্মেঘ আকাশ, তার তলায় মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন, তালীকুঞ্জ, বাঁশঝাড়, ঝোপঝাপ, ঝিল-খাল-পুকুর। তারপর তিনি হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌছতে এখনও বিলম্ব আছে।

খবরের কাগজে অদ্ভুত এই হারাধনের দ্বীপ সম্বন্ধে যে-সব কথা বেরিয়েছে, তিনি মনে মনে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। হারাধনের দ্বীপ? এমন দ্বীপের নাম কেউ কখনো শোনেনি। অথচ এই অশ্রুত দ্বীপের কথা নিয়ে আজকাল কাগজওয়ালারা ক্রমাগত মাথা না ঘামিয়ে পারছে না।

সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোটো-বড়ো-মাঝারি দ্বীপ আছে অনেকগুলি। কোনো কোনো বড়ো দ্বীপের নাম আছে, আবার অনেক দ্বীপই হচ্ছে একেবারেই অনামা। গত মহাযুদ্ধের সময় কে-এক সাধারণ ব্যক্তি ধনকুবের রূপে অসাধারণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হয়ে সে আবু হোসেনের মতো টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দেয়। সেই সময়ে কী এক আজব খেয়ালের দ্বারা চালিত হয়ে সে গঙ্গাসাগরের কাছে ছোটো একটি নামহীন দ্বীপ ক্রয় করে ফেলে, তারপর নিজের মর্জি অনুসারে সেই দ্বীপের নাম দেয়—‘হারাধনের দ্বীপ’। এবং অজস্র টাকা ঢেলে সেই বিজন দ্বীপের উপরে প্রাসাদের মতো মস্ত একখানা বাড়ি তৈরি করায়।

হাতে টাকা থাকলে মানুষ খেয়ালের বশে সব কিছুই করতে পারে। দিবাস্বপ্নে অনেক কিছুই চমৎকার বলে মনে হয়, কিন্তু কঠিন বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালে সুখের স্বপ্ন ছুটে যেতে বিলম্ব হয় না। এই আধুনিক আবু হোসেনও সেই সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলে। দ্বীপে যাতায়াত করবার জন্য নিয়মিত কোনো জলযানের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই কলকাতা থেকে আবশ্যক জিনিসপত্তর— বিশেষ করে আহার্য্যসামগ্রী—যথাসময়ে সরবরাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। তার উপরে বর্ষাকালে সামুদ্রিক ঝড় যখন দুর্বার বেগে দ্বীপকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং দিন-রাত ধরে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় দ্বীপ হয়ে পড়ে জলে জলে জলময়, তখন দ্বীপের নবাগত বাসিন্দাদের জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বহ। সুতরাং সেই হঠাৎ নবাবের খেয়াল ছুটে যেতে বেশি দেরি লাগল না।

মাস কয়েক যেতে না যেতেই সে আবার কলকাতায় পালিয়ে এসে, বাড়ি সমেত সেই দ্বীপটাকে জলের দরে বেচে ফেলবার জন্যে খবরের কাগজে উজ্জ্বল ভাষায় বড়ো বড়ো হরফে বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। কিছুদিন পরেই শোনা গেল, আবার কে এক নির্বোধ ব্যক্তি পরে পস্তাবে বলে সস্তায় সেই দ্বীপটা কিনে নিয়েছে।

চন্দ্রবাবু নিজের পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন একখানা চিঠি। পত্রলেখকের হাতের লেখা যার-পর-নাই খারাপ, কিন্তু জায়গায় জায়গায় তা আবার এমন স্পষ্ট যে পড়তে কোনোই কষ্ট হয় না ঃ–

প্রিয় চন্দ্রবাবু...অনেক কাল আপনার কোনো খবর পাইনি। ...কিন্তু আপনাকে এই হারাধনের দ্বীপে আসতেই হবে...পরিস্থানের মতো সুন্দর দ্বীপ.কত কথাই বলবার আছে..সেই পুরনো-দিনের কথা...প্রকৃতির কোলে বসে উপভোগ করব সূর্যের সোনার কিরণ..আসতেই হবে, নিশ্চয়ই আসবেন। ...আসচে বারেই

তারিখে পোর্ট ক্যানিংয়ে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আর প্রস্তুত থাকবে আমাদের একখানা লাঞ্চ'।

তলায় নাম সই করা হয়েছে—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

চন্দ্রবাবু ভাবতে লাগলেন। আট-দশ বছর আগে দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে এক চারুশীলা দেবীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত ধনী জমিদারের বিধবা সহধর্মিণী । তখন তার বয়স ছিল বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ। তিনিও ছিলেন অতিশয় খামখেয়ালি ।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন ভূতপূর্ব জজ চন্দ্রকান্ত চৌধুরি।

শ্রীমতী স্বপ্না সেন। সেই ট্রেনেই একখানি তৃতীয় শ্রেণির কামরায় চড়ে যাত্রা করছে পোর্ট ক্যানিং-এর দিকেই। কামরায় আরও কয়েকজন যাত্রী রয়েছে। সকলেই পরিচিত। স্বপ্না মনে মনে ভাবছিল, ভাগ্যে সে কর্মপ্রার্থী হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাই এতদিন পরে অস্থায়ী হলেও একটা ভালো কাজ পাওয়া গেল। তাকে হতে হবে একজন মহিলার সঙ্গিনী।

পকেট থেকে একখানি পত্র বার করে সে পড়তে লাগল – 'সংবাদপত্রে আপনার বিজ্ঞাপন দেখেছি। আপনি যে মাহিনী চেয়েছেন তা দিতে আমার আপত্তি নেই। বারোই তারিখে বৈকালবেলায় আমি 'পোর্ট ক্যানিং'এ হাজির থাকব। সেই সময়েই আমার সঙ্গে দেখা করলে আনন্দিত হব। রাহা খরচের জন্যে ২০/= টাকা পাঠালুম। ইতি—শ্রীমতী কাননকুন্তলা দেবী।

কাননকুন্তলা! বাবা, কী কষ্টকল্পিত নাম? ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক, নইলে একটা দ্বীপকে-দ্বীপই কিনে ফেলতে পারেন? দ্বীপের নামটাও কী বেয়াড়া! 'হারাধনের দ্বীপ'! কে কবে শুনেছে এমন নাম?

স্বপ্নার মন হঠাৎ ফিরে গেল পিছনের দিকে মনে পড়ল তার কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের কথা। তার কাছে সে কাজ করেছে প্রায় দুই বৎসর। কাজ কিছু কঠিন নয়, বিপত্নীক নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র শিশুপুত্রকে দেখাশুনা করবার

ভার ছিল তারই উপরে। নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র বংশধর নীরেন্দ্রনারায়ণ। সেই হত তার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

স্বপ্না শিউরে উঠল। নরেন্দ্রনারায়ণ–নরেন্দ্রনারায়ণ—না, না, নরেন্দ্রনারায়ণের কথা মন থেকে তার একেবারেই মুছে ফেলা উচিত!

কিন্তু—কিন্তু আর একটা করুণ দৃশ্য যে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না! পুরীর সেই সমুদ্রতীর! নীরেন্দ্রনারায়ণের ছোট্ট মুখখানি একবার ভাসছে, একবার ডুবছে—ভেসে যাচ্ছে উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে। সে-ও তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাপ দিলে বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত ভাবেই জানত সে, কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না তাকে।

না, না, কেন সে আবার ভেবে মরছে এইসব দুঃস্বপ্নের কথা?

নিজের মনকে শক্ত করে স্বপ্না কামরার জানলার দিকে ফিরে বসল। চেয়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির নাচঘরে চলচ্চিত্রের পর চলচ্চিত্র—এক ছবি সুমুখে আসে, আর এক ছবি মিলিয়ে যায়!

স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠিক তার সামনের বেঞ্চিতেই বসেছিল অমলেন্দু সেন।

নিজের মনে মনেই সে বললে, মেয়েটি সুন্দরী বটে। বেশ বুদ্ধিমতী বলেও মনে হয়। আচ্ছা পরে এর সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মন আবার বলে উঠল, ধ্যেৎ, এসব আলাপ-পরিচয়ের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই। এখন কাজের সময়, সে এসেছে জরুরি কাজের ভার নিয়ে।

হুঁ। অ্যাটনি বিজন বোস। লোকটা হচ্ছে অত্যন্ত রহস্যময়। বলে কিনা, বেশি কথার দরকার নেই অমলেন্দুবাবু। আপনার মত কী বলুন? হ্যাঁ, কি না?

অমলেন্দু বলে, আপনি পাঁচ হাজার দিতে চান? এমন অবহেলাভরে কথাগুলো সে বলেছিল, যেন পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য

নয়। অথচ সে সময়ে পরের দিনের খাবার কেনবার সামর্থ্যও তার ছিল না। সে সময়ে এটুকুও সে বুঝতে পেরেছিল যে, বিজন বোস তার অবহেলার ভাবটা মোটেই আমলে আনেনি। অ্যাটর্নিদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। বিজন বোস চুপ করে আছে দেখে সে আবার শুধোয়, তাহলে এ বিষয়ে আপনি আর কোনো খবর দিতে রাজি নন? বিজন বোস নিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, না অমলেন্দুবাবু! আমার মক্কেল ভালো করেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আপনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেও আপনার বর্তমান আর্থিক অবস্থা এখন সচ্ছল নয়। তারই কথামতো আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব এই শর্তে যে, আসছে ১২ই তারিখে বৈকালবেলায় আপনি 'পোর্ট ক্যানিং-এ গিয়ে হাজির থাকবেন। সেখান থেকে একখানা মোটরলাঞ্চ আপনাকে নিয়ে হারাধনের দ্বীপে যাত্রা করবে। তারপর দ্বীপে উপস্থিত হয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে আমার মক্কেলের ইচ্ছা অনুসারে।

অমলেন্দু বলে, সেই দ্বীপে আমাকে থাকতে হবে কতদিন?

—এক সপ্তাহের বেশি নয়।

অমলেন্দু অল্পক্ষণ চিন্তা করে বলে, কিন্তু জেনে রাখবেন, আমি কোনো বেআইনি কাজ করতে প্রস্তুত নই।

মুখ টিপে মৃদু হাসি হেসে বিজন বোস বলে, কেউ আপনাকে বে-আইনি কাজ করতে বললে দ্বীপ থেকে অনায়াসেই আপনি চলে আসতে পারবেন, কেউ বাধা দেবে না।

নিকুচি করেছে! এতক্ষণ পরে লোকটা আবার মুখ টিপে হাসলে। আইনবিরুদ্ধ কাজ করা অমলেন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ নয়, ও-হাসি যেন ইঙ্গিতে সেই কথাই প্রকাশ করতে চায়! হ্যাঁ, দু-এক বার নিজেকে সামলাবার জন্যে তাকে এমন কিছু করতে হয়েছে, তা মুখ ফুটে বলা যায় না দশ জনের সামনে। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে সামলে নিতে পেরেছে, কোনো বাধা না মেনেই। —হ্যাঁ, কোনো বাধা না মেনেই।

তা হারাধনের দ্বীপটা তার কাছে বোধহয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না। একসঙ্গে ভ্রমণ ও অর্থোপার্জন!

গাড়ির একটা কোণ নিয়ে সিধে হয়ে চুপ করে বসেছিলেন সৌদামিনী দেবী। বয়স তার পয়ষট্টির কম হবে না। একহারা দেহ, ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। মাঝে মাঝে বিরক্ত চোখে কামরার অন্যান্য লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কামরার ভিতরে ভিড় আর গ্রীষ্মের আতিশয্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। একটু অসুবিধা কেউ সইতে পারে না, সবতাতেই বাড়াবাড়ি। এই তো আমি কেমন স্থির ও শান্তভাবে বসে আছি! আমাকে দেখেও কি ওদের বুদ্ধি হয় না?

কামরার ভিতরে ছিল জন-চারেক তরুণী। তাদের হাবভাব ও সাজপোশাক একেবারে বেহদ বেহায়ার মতো। আমাদেরও বয়সকালে মেয়েরা সাজপোশাক ভালোবসত। কিন্তু তখন তো এমন নির্লজ্জতা কখনো দেখিনি! কালে কালে হল কী? এদের কঠিন শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সৌদামিনী তাকালেন জানলার বাইরের দিকে। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে না, মনে মনে ভাবছিলেন তিনি গত বৎসরের কথা।

হ্যাঁ, গত বৎসরে এই সময়ে তিনি ছিলেন গিরিডিতে। এবারে চলছেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, হারাধানের দ্বীপে।

‘ভ্যানিটি কেস’ থেকে একখানা আগে-পড়া চিঠি বার করে আবার পড়তে লাগলেন —

প্রিয় সৌদামিনী দেবী, আশা করি আমাকে আপনি ভুলে যাননি। কয়েক বৎসর আগে আমরা দুজনে পশ্চিমে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়েছিলুম, এ কথা আপনার মনে আছে তো? সেদিনের মিলন-স্মৃতি আজও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে।

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে আমি একটি ছোটো দ্বীপ কিনেছি। সেখানে মনের মতো একখানি বাড়িও পেয়েছি। তার ভিতরে গিয়ে বসলে আপনি ভুলে যাবেন সব একেলে ঝঞ্ঝাটের কথা—অর্থাৎ এরোপ্লেন, ট্রাম-বাস-মোটর, গ্রামোফোন, রেডিয়ো-সিনেমা আর মেয়েদের আধ-ফুট-উঁচু হাই-হিল জুতোর কথা। আপনি যদি মাসখানেক এখানে এসে যাপন করেন, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। জায়গাটির একটি নামও দিয়েছি—'হারাধনের দ্বীপ'। নামটা সেকেলে, নয়? তা আমরা দুজনেই তো সেকেলে যা-কিছু পছন্দ করি। আসবেন। আসছে ১২ই তারিখে বৈকালবেলায় 'পোর্ট ক্যানিং-এ আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকব।

ইতি—

আপনার কাঃ কুঃ

আবার কাঃ কুঃ? মানুষটি কে? সাটে নাম লিখেছে কেন? ফি বছরেই তো একবার করে এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস তার আছে। কবে, কোথায় এই মানুষটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে না তো! তিনি মেয়ে না পুরুষ? লেখার ছাদ দেখে তো মনে হয় মেয়েমানুষ। তা যিনিই হোন, বিনা পয়সায় এমন বেড়িয়ে আসবার লোভ তো ছাড়া যায় না! শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কেন?

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকালেন মেজর সেন। একে তো এইসব পাড়াগেঁয়ে ট্রেনগুলো গোরুর গাড়ির সঙ্গে তাল

রেখে চলবার চেষ্টা করে, তার উপরে ঘড়িঘড়ি যখন-তখন যে কোনো স্টেশনে এসে আচল হয়ে থাকা। জ্বালাতন!

কিন্তু এই 'কাঃ কুঃ' লোকটা কে? লিখেছে: আমাদের এই হারাধনের দ্বীপে এলে আপনার দুইজন পুরাতন বন্ধুর দেখা পাবেন। আমিও আপনার কাছে নতুন মানুষ নই। সবাই মিলে কিছুদিন আবার পুরাতন স্মৃতির জগতে রাস করা যাবে।

পুরাতন স্মৃতির জগতে? সেখানে বাস করার জন্যে তার মনে কোনোই আগ্রহ নেই। সেখানে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভালো লাগে না তার। অতীত কালের কথা ভাবলেই মনে জাগে তার বিশেষ এক ঘটনার স্মৃতি। সে ঘটনা তিনি লুকিয়ে রাখতে চান সন্তপর্ণে।

কিন্তু চুলোয় যাক সেসব কথা। এই হারাধনের দ্বীপের রহস্যটা কী? আজকাল খবরের কাগজে প্রায়ই এই অজানা দ্বীপটার সম্বন্ধে অদ্ভুত-সব কাহিনি পাঠ করা যায়। হঠাৎ সেখানে তার আমন্ত্রণ হল কেন?

ভেবেচিন্তে কোনোই সুরাহা হল না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলে। তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

ডাক্তার বোস গম্ভীরভাবে তার রিজার্ভ করা কামরার ভিতরে বসে আছেন।

আজ জীবনের পথ হয়েছে তার কুসুমাস্তৃত। অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক কাঁটাঝোপ পার হয়ে আজ তিনি যে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা নিয়ে যাবে তাকে উচ্চতম, সৌভাগ্যের দিকে। আজ তার হাতযশের কথা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে। তাকে ঘিরে থাকে রোগীদের জনতা, না-চাইতে তার ঘরে এসে পড়ে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা। কয়েক বৎসর আগেও এটা ছিল স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তার বর্তমান উপভোগ্য, তার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

কেবল অতীতে থেকে গিয়েছে একটি খুঁত। তখনও তিনি আরোহণ করেছেন খ্যাতির সোপানে, কিন্তু একটি মাত্র ঘটনা তার জীবনকে করে তুলেছিল অপ্রীতিকর। কেবল অপ্রীতিকরই নয়। আর-একটু হলেই ভেঙে পড়তে পারত তাঁর যশের ভিত্তি। থাক সে কথা, নতুন করে আর ভাবার দরকার নেই। কিন্তু এই লোকটা কে? এমন করে নিজের নাম সই করেছে, ভালো করে পড়াই যায় না। কিন্তু সে যে তাকে চেনে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। হারাধনের দ্বীপে গিয়ে কিছুদিন অবকাশ যাপন করার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি।

অবকাশ! যেন অবকাশের সুযোগ তাঁর আছে। রোগী আর রোগী, টাকা আর টাকা! রোগী দেখা বন্ধ করলে টাকা আসাও বন্ধ হয়। কিন্তু রোগী আর টাকা নিয়েই তো প্রতিদিন কাটিয়ে দেওয়া চলে না। মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়তে না পারলে জীবন যে হয়ে উঠবে বিষাক্ত। হ্যা, ইতিমধ্যেই তার জীবন হয়ে উঠেছে ভারবহ। কিছুদিনের ছুটি না নিলে এ ভার আর নামবে না। তাই তিনি গ্রহণ করেছেন এই আমন্ত্রণ।

ট্রেনের আর-একটি কামরায় বসে মহেন্দ্র নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর মনে মনেই বললে, 'পোর্ট ক্যানিং-এ পৌছতে আর বেশি দেরি নেই।' বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে বার করলে একখানা পকেটবুক। তারই খানকয় পাতা উলটে এক জায়গায় থেমে সে কতকগুলো নামের ফর্দ পাঠ করতে লাগল: চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, স্বপ্না সেন, অমলেন্দু সেন, সৌদামিনী, মেজর সেন, ডাক্তার বোস, মনোতোষ চৌধুরি এবং নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা—স্বামী আর স্ত্রী। বাড়িখানা তদারক করার ভার আছে শেষ দুজনেরই উপরে।

মহেন্দ্র নিজের মনেই বললে, তাহলে এই ক-জনকে নিয়েই আমার কারবার। তা এদের নিয়ে বেশি বেগ পেতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

পকেটবুকখানা আবার বুকপকেটের ভিতরে স্থাপন করে জানলা দিয়ে সে একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিলে। পাশের কামরার আর এক ভদ্রলোকও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছেন। তার সঙ্গে চোখাচৌখি হতেই মহেন্দ্র জানলার কাছ থেকে সরে এসে বসল। আপন মনে বললে, গোঁফ দেখেই চিনেছি! সেই মিলিটারি ভদ্রলোক! উনি আমাকে চিনতে পারলেন কি না জানি না। কিন্তু যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, আমি কী বলব? বললেই হবে, আমি সিংহল-প্রবাসী বাঙালি, স্বদেশে বেড়াবার শখ হয়েছে, তাই এদিকে এসেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পোর্ট ক্যানিং!

যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে আছেন—পরস্পরের কাছ থেকে খানিক খানিক তফাতে। প্রত্যেকের দৃষ্টি কৌতুহলী ও অনুসন্ধিৎসু। প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। সেই সব দৃষ্টি দেখলে তারা কেউ কারুকে চেনে বলে মনে হয় না।

চন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে সৌদামিনী দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে বললেন, আজকের আকাশটা বেশ পরিষ্কার দেখছি।

সৌদামিনী কাঠের পুতুলের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এটা ভালো লক্ষণ। জলপথে যেতে হবে, জলঝড়ের ভয় নেই।

সৌদামিনীর মনে হল, একে দেখলে বোধ হয়, বিশিষ্ট কোনো ভদ্রলোক। চেহারায় আভিজাত্য আছে। যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি উচ্চশ্রেণিতে ওঠা-বসা করেন।

চন্দ্রবাবু শুধোলেন, আপনি এ-অঞ্চলে আগে কখনো এসেছেন কি?

সৌদামিনী বললেন, আজ্ঞে না।

—চারুশীলার সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

সৌদামিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, চারুশীলা দেবী কে?

—যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

—আমাকে তো চারুশীলা দেবী নিমন্ত্রণ করেননি!

—তবে?

—পুরো নামটাও আমি বলতে পারব না। আমি যে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি, তার তলায় আছে একটা নামের দুটো আদ্য অক্ষর—কাঃ কুঃ।

—বটে? বটে। চন্দ্রবাবু আর কিছু বললেন না, একেবারে গুম হয়ে রইলেন। তিনি ভূতপূর্ব জজসাহেব বটে, কিন্তু এখনও তার বুকের ভিতরে সজাগ হয়ে আছে বিচারকের মন।

অমলেন্দু অগ্রসর হয়ে স্বপ্নার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, আপনিও কি আমাদের সঙ্গে হারাধনের দ্বীপে যাবেন?

স্বপ্না বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমলেন্দু বললে, আমরা কেউ কারুকে চিনি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বাস করতে হবে এক বাড়িতেই! আমার নাম অমলেন্দু সেন।

স্বপ্না বললে, আমার নাম স্বপ্না সেন।

অমলেন্দু বললে, আপনি কি এই দ্বীপে আগে কখনো এসেছিলেন?

—জীবনে নয়। এমনকি যিনি আমাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাকেও কখনো চোখে দেখিনি।

—ভারী আশ্চর্য কথা তো! কে আপনাকে কাজে নিযুক্ত করেছেন?

—কাননকুন্তলা দেবী।

অমলেন্দু মনে মনে ভাবতে লাগল, তবু একটা হদিস পাওয়া গেল। সেই সেয়ানা অ্যাটর্নি বিজন বোস আমার কাছে তার মক্কেলের নামও করেনি। এই মহিলা আর আমার অবস্থা দেখছি একই রকম—যার কাছে কাজ করতে যাচ্ছি তাকে আমরা কেউই চিনি না। এতক্ষণে বোঝা গেল তিনি হচ্ছেন স্ত্রীলোক।

মেজর সেনের ভাব দেখলে মনে হয় যেন তিনি কিঞ্চিৎ অধীর হয়ে উঠেছেন! হাতের ছড়ি দিয়ে সামনের একটা ঝোপের উপর বারকয়েক আঘাত করে তিনি অমলেন্দু ও স্বপ্নার কাছে এসে বললেন, আপনারাও কি হারাধনের দ্বীপেই যাবেন?

অমলেন্দু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলতে পারেন, কার জন্যে আমরা এখানে অপেক্ষা করছি?

—কাননকুন্তলা দেবীর জন্যে। তিনিই সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু তিনি এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছোননি।

এমন সময়ে একটি নূতন লোক এলে সকলকে শুনিয়ে বললে, আপনারা এখন মোটরলাঞ্চে গিয়ে উঠতে পারেন।

লোকটির মাথায় ফেজটুপি, গায়ে কোট, পরনে ইজের। ডাক্তার বোস এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন তিনি বললেন, তুমি কে?

—আমার নাম মহম্মদ ইব্রাহিম। আমি মোটরলাঞ্চের চালক।

মহেন্দ্র বললেন, মনোতোষ চৌধুরিরও আমাদের সঙ্গে যাবার কথা। তিনি এখনও আসেননি।

ইব্রাহিম বললে, তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি নিজের মোটরবোটে করেই দ্বীপে উঠবেন।

ডাক্তার বোস বললেন, কিন্তু যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি কোথায়?

ইব্রাহিম বললে, খবর পেলুম তিনি ট্রেন ফেল করেছেন। বোধ হয় পরের ট্রেনেই আসবেন।

চন্দ্রবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, গৃহকর্তা অনুপস্থিত। আমরা অতিথি হয়ে কার কাছে যাব?

ইব্রাহিম বললে, সেজন্য আপনাদের কারুকে কিছু ভাবতে হবে না। দ্বীপের বাড়িতে নিত্যানন্দবাবু আর তার স্ত্রী আছেন, তিনিই আপনাদের দেখাশুনা করার ভার নেবেন। কিন্তু আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না। সন্ধে হবার আগেই আমি মোটরলাঞ্চে স্টার্ট দিতে চাই।

মহেন্দ্র নিজের মনে মনেই বলল, ব্যাপারটা যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে! দেখছি আমার দৃষ্টিকে রীতিমতো সজাগ রাখতে হবে।

সৌদামিনী বললেন, আমরা দ্বীপে কখন গিয়ে পৌঁছেব?

ইব্রাহিম বললে, কাল সকালে।

মেজর সেন শুধোলেন, রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?

ইব্রাহিম বললে, খাবার-দাবার এর মধ্যেই লাঞ্চে এসে গিয়েছে।

অমলেন্দু ভাবলে, গৃহকর্তা নেই, কিন্তু আর সব ঠিক আছে! এ যে কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণলীলার ব্যাপার! আমার কেমন খটকা লাগছে! একজন স্ত্রীলোকের কাছে চাকরি নিয়েছি, তাঁর নাম নাতি কাননকুন্তলা। পেয়েছি পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু কেন? আমায় কী করতে হবে?

রাত্রের ব্যবস্থা ভালোই হয়েছিল। আহার ও শয়নের জন্যে কারুকেই কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

রাত্রে আকাশে চাঁদ ওঠেনি, চারিদিক ঢাকা ছিল অন্ধকারের আবরণে। চাঁদের আরো ফুটলে যাত্রীরা হয়তো নদীর দুই তীরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্যে জেগে থাকতেন কিছুক্ষণ। স্তব্ধ রাত্রে নদীর জলকল্লোল শুনলেও মাধুর্য উপভোগ করা যায়। কিন্তু চলন্ত মোটরলাঞ্চে কর্কশ শব্দ তারও মিষ্টতাটুকু নষ্ট করে দিয়েছিল। কাজেই আহারাদির পরেই সকলে যে-যার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বপ্না ভাবলে, আর-সবাই এখনও বোধ হয় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে তার ধারণা ভ্রান্ত। লাঞ্চের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুই মূর্তি—অমলেন্দু আর মহেন্দ্র।

অমলেন্দু হেসে বললে, সুপ্রভাত, স্বপ্না দেবী! এত সকালে উঠেছেন? রাত্রে বুঝি ভালো ঘুম হয়নি?

স্বপ্না বললে, না, আমি খুব ঘুমিয়েছি। একটা স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। বাঃ, পূর্ব দিকে কী রামধনু-রঙের বাহার, চমৎকার!

অমলেন্দু বললে, চমৎকার বলেই তো এত ভোরে বিছানার মায়া ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি। এখনও চারিদিক রহস্যময় হয়ে আছে। কিন্তু এখনই সূর্য উঠবে, সমস্ত রহস্য মিলিয়ে যাবে তার স্পষ্ট আলোয়।

স্বপ্না বললে, রহস্য আমি ভালোবাসি, অমলেন্দুবাবু! এই অল্প আলোছায়ামাখা পৃথিবীকে মনে হয় কেমন একটা মায়ালোকের মতো! সর্বত্র জেগে থাকে কেমন যেন কল্পনার খেলা—কেমন যেন সম্ভাবনার ইঙ্গিত?

মহেন্দ্র মৃদু হাস্য করে বললে, তাহলে স্বপ্না দেবী, এই জলযাত্রা নিশ্চয়ই আপনার ভালো লেগেছে?

স্বপ্না বললে, আপনি একথা বলছেন কেন?

মহেন্দ্র বললে, এও তো একটা রহস্যময় ব্যাপার—'

—রহস্যময়?

—নিশ্চয়। যে দ্বীপের দিকে যাচ্ছি, তার কথা আমরা কেউ কিছু জানি না। আমরা যার আতিথ্য গ্রহণ করব, তিনিও উপস্থিত নেই। আমরা এখানে আছি সাত জন। আরও একজন নতুন অতিথি নাকি আসবেন, কিন্তু আমরা কেউ কারুকেই চিনি না। সমগ্র ব্যাপারটাই কি রহস্যময় নয় স্বপ্না দেবী?

স্বপ্না কোনো জবাব দিলে না।

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দৃষ্টি রেখে পূর্ব আকাশের দিকে। প্রাতঃসূর্যের রক্তমুখ দেখা গেল ধীরে ধীরে। তার দীপ্তির তপ্ততায় গলে মিলিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য!

প্রভাত-সূর্যের কিরণ-হার নদীর জলে যখন চকমকিয়ে দুলে দুলে উঠছে, খানিক তফাত থেকে ভেসে এল একটা ধ্বনি। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

মহেন্দ্র বললে, মোটরবোটের আওয়াজ! ওই যে, এইবারে দেখা যাচ্ছে বোটখানা। উঃ, ওখানা ছুটে আসছে কী ভীষণ বেগে!

অমলেন্দু বললে, মনোতোষ চৌধুরি নামে এক ভদ্রলোকের মোটরবোটে আসবার কথা ছিল না? বোধহয় তিনি আসছেন।

মহেন্দ্র বললেন, খুব সম্ভব তাই।

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কৌতূহল চোখে। বাস্তবিক, বোটখানা ছুটে আসছিল একেবারে চরম বেগে। নদী এখানে অত্যন্ত বেগবর্তী, যে-কোনো মুহূর্তে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, চালক যেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতে রাজি নয়। দেখতে দেখতে দুই দিকে ক্রুদ্ধ ও শুভ্র ফেনায়িত তরঙ্গমালাকে উদ্বেলিত করে তুলে মোটর-বোটখানা কাছে এসে পড়ল। চালকের আসনে আসীন যে যুবকের মূর্তি, দেখলে মনে হয় সে মূর্তি যেন পার্থিব নয়, স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ যেন কোনো তরুণ দেবতা সারথি হয়ে বিদ্যুৎগতিতে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন এই জলযানকে! দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ, তপ্ত-কাঞ্চননিভ বর্ণ, মাথার চুলগুলো পিছনে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ছে প্রবল বাতাসে।

বোটের হর্ন বেজে উঠল সজোরে, তারপর সেখানা লাঞ্চের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল তীব্র বেগে ।

লাঞ্চ চালাতে চালাতে বোটের দিকে তাকিয়ে মহম্মদ ইব্রাহিম নিজেকে শুনিয়ে নিজেই বললে, এতক্ষণ পরে একটা মানুষের মতো মানুষের দেখা পাওয়া গেল! ওই ভদ্রলোকই বোধহয় মনোতোষ চৌধুরি? চমৎকার চেহারা, চমৎকার বোট আর চমৎকার ওঁর চালাবার কায়দা! ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক। লাঞ্চের উপরে যতগুলো মূর্তি আছে, ওদের কারুকেই আমার পছন্দ হয় না। কারুর কারুর চেহারা অমনি এক-রকম ভব্যিযুক্ত বটে, কিন্তু সেই

যেন-বা মাস্টারনি। এমন একটা দ্বীপ যিনি কিনে ফেলেছেন, নিশ্চয়ই তিনি খুব বড়োলোক আর বরেদী ঘরের ছেলে! কিন্তু যাদের তিনি নিমন্ত্রন করেছেন, তাদের চেহারা দেখলে ভক্তি হয় না কেন?

কিন্তু ও-সবের চেয়েও মস্ত একটা আজব কথা এই যে, ওঁদের যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন আর আমার হাতে দিয়েছেন এই লাঞ্চ চালাবার ভার, আমি এখনও পর্যন্ত তাকে একবার চোখেও দেখতে পেলুম না। এরকম কথা কে কবে শুনেছে! কলকাতার সেই অ্যাটনিবাবু মধ্যস্থ হয়ে আমাকে নিযুক্ত করেছেন, আমার উপরে হুকুম আছে যে অতিথিদের দ্বীপে নামিয়ে দিয়েই আমি যেন আবার ফিরে যাই। ভিতরের ব্যাপারটা যে কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। তা বড়োলোকদের কথা বড়োলোকরাই জানে, খামোকা আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী? আমার দরকার টাকা নিয়ে। আমি পাব দ্বিগুণ টাকাই!

সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। উচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠল, হারাধনের দ্বীপ, হারাধনের দ্বীপ। দূরে ওই দেখা যাচ্ছে হারাধনের দ্বীপ!

মোটরলাঞ্চ দ্বীপের কাছে তীর পর্যন্ত গেল না, কারণ জল সেখানে অগভীর। সকলে ছোটো একখানি নৌকোয় চড়ে একে একে দ্বীপের উপরে গিয়ে নামলেন। সামনেই অনেকখানি খোলা জমি, তার আশেপাশে জঙ্গল আর বন্য গাছপালার ভিড়। দেখলেই বোঝা যায়, জঙ্গল সাফ করে এই খোলা জমিটা প্রস্তুত করা হয়েছে। সবুজ ঘাসের আস্তরণে মোড়া জমি, কোথাও আগাছার চিহ্নটুকুও দেখা যায় না। তারই মাঝখান দিয়ে ছোটো একটি পাকা রাস্তা সিধে চলে গিয়েছে এবং রাস্তার শেষে দেখা যাচ্ছে বেশ একখানা বড়োসড়ো লাল রঙের দোতলা বাড়ি— তাকে অনায়াসেই অট্টালিকা বলে গণ্য করা চলে। একেবারে

হালফ্যাশনের বাড়ি, এমন জায়গায় এরকম বাড়ি দেখলে মনে জাগে রীতিমতো বিস্ময়!

স্বপ্না খুব খুশিমুখে বলে উঠল, বাঃ, কী সুন্দর বাড়িখানি!! ঠিক যেন ছবির মতো!

ডাক্তার বোসের মনে হলো বাড়িখানা সুন্দর হলেও কেমন যেন রহস্যময়। অসাধারণ স্থানে অসাধারণ বাড়ি এবং অসাধারণ কোনো-কিছুই ডাক্তার বোস পছন্দ করেন না।

সৌদামিনী মনে মনে বললেন, এই নির্জন দ্বীপে লোকালয় থেকে বহুদূরে এসে বাড়িখানাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন হানাবাড়ি! কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই! এখানে কি মানুষ থাকতে পারে?

সকলে রাস্তা ধরে খোলা জমি পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে পড়ল। তারপর গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে বাড়ির সদরের কাছে আসতেই দেখা গেল, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি, মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন। জামাকাপড় অত্যন্ত সাদাসিধে।

চন্দ্রবাবু এগিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুধোলেন, কে তুমি?

লোকটি বললে, আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস। আমার উপরে হুকুম আছে, আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে।

—কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে?

—আমাদের মনিব।

—তার নাম কী?

—জানি না।

মহেন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, মিনিবের নাম জানো না।

স্বপ্না বললে, তার নাম বোধহয় কাননকুন্তলা দেবী?

চন্দ্রবাবু বললেন, কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন চারুশীলা দেবী।

নিত্যানন্দ বললে, আপনারা যাদের কথা বলছেন, তাদের নাম আমি শুনিনি। খালি এইটুকুই জানি যে, আমার মনিবের কথামতো অ্যাটর্নি বিজনবাবু আমাকে আর আমার স্ত্রীকে এখানকার কাজে নিযুক্ত করেছেন। আর এটাও আমাকে জানানো হয়েছিল, আজ সকালে আপনারা সবাই এখানে এসে পৌঁছবেন।

মেজর সেন বললেন, তোমাদের মনিব ট্রেন ফেল করে আজ আমাদের সঙ্গে আসতে পারেননি। খুব সম্ভব তিনি কালকেই এসে পড়বেন। কিন্তু আপাতত আমরা কী করব? কে কোথায় থাকব? আহারাদির ব্যবস্থা কী হবে?

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটি যুবক বললে, কারুকে কোনোই দুশ্চিন্তা করতে হবে না! এর মধ্যেই বাড়ির সব জায়গায় আমি টহল দিয়ে এসেছি। মস্ত বাড়ি—একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ এখানে বাস করতে পারে।

প্রকাণ্ড ভাড়ার ঘর, রাশি রাশি খাবার জিনিস জমা করা আছে। রান্নাঘরে নিত্যানন্দের স্ত্রী সত্যবালা আগুন দিয়েছে তিনটে উনুনে। সুতরাং মাভৈঃ!

সকলেই যুবকদের দেখেই চিনতে পারলেম ভোরবেলায় মোটরবোটের চালকের আসনে বসে ছিল এই মূর্তিই।

মহেন্দ্র শুধোলে, আপনিই কি মনোতোষবাবু?

যুবক দুই ভুরু নাচিয়ে বললে, আরে, বাহবা কী বাহবা! এই মধ্যেই আমার নাম পর্যন্ত আদায় করে ফেলেছেন দেখছি! আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, পিতৃদেব ওই নামই রেখেছিলেন বটে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সব কথা নীরবে শুনছিল অমলেন্দু। এইবারে সে অগ্রসর হয়ে বললে, নিতানন্দ, তোমার মনিবের বদলে তুমিই যখন আছ, আগে আমাদের সকলের মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করে দাও দেখি! তারপর

হাতমুখ ধুয়ে আমরা সকলেই চা-পান করতে চাই। কোনো অসুবিধা হবে না তো?

নিত্যানন্দ বললে, কিছু না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা প্রস্তুত হয়ে যাবে। আসুন আমার সঙ্গে আসুন।

নিত্যানন্দ গলা তুলে বললে, সত্যবালা, মেয়েদের ঘর-দুটো দেখিয়ে দাও। তারপর ফিরে সৌদামিনী ও স্বপ্নার উদ্দেশ্যে বললে, আপনারা আগে অনুগ্রহ করে উপরে যান। ওইদিকে গেলেই সিঁড়ি পাবেন। বলে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

স্বপ্না কার্পেটপাতা সুদৃশ্য পালিশ করা কাঠের সোপানশ্রেণি দিয়ে উপরে উঠে দেখতে পেলে, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বললে, আমার সঙ্গে আসুন।

—তোমার নামই সত্যবালা?

—হ্যাঁ। বাছা।

তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে স্বপ্না একটি ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। চমৎকার সাজানো-গুছানো ঘর। ধবধপে বিছানা-পাতা খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, কৌচ ও সোফা প্রভৃতি কোনো আসবাবেরই অভাব নেই। মার্বেলপাথরের মেঝে, মাঝখানে নরম কাপেট বিছানো।

সত্যবালা বললে, ওই দরজা খুললে স্নানের ঘর পাবেন। আর যখনই আমাকে দরকার হবে, ঘণ্টা বাজালেই আমি শুনতে পাব। আপনার আর কিছু দরকার আছে?

—আমার সুটকেস এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

—এখনই দিচ্ছি, বলেই সত্যবালা প্রস্থানোদ্যত হল।

স্বপ্না বললে, দাঁড়াও, তোমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর-কেউ আছে?

—না?

—আমরা আট জন লোক। তোমরা দুজনে আমাদের সামলাতে পারব কি?

—বোধহয় পারব। আর,আমাদের মনিব তো দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। শুনলুম, তারও সঙ্গে নিশ্চয়ই দাস-দাসীরা আসবে। এই বলে সত্যবালা ঘরের ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

স্বপ্না একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন দ্বীপ, তার ওপারে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের অসীমতা। চারিদিকে একান্ত স্তব্ধতার বীণায় বেজে উঠছে মাঝে মাঝে গানের পাখিদের সুর। তারপরে ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ ধরে সে পায়চারি করলে, মুখে তার কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন খাপছাড়া বলে মনে হল। গৃহকর্তা অনুপস্থিত, অতিথিদেরও যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব! সবই অদ্ভুত!

হঠাৎ তার চোখ পড়ল দেওয়ালের এক জায়গায়। ড্রেসিং টেবিলের উপরে একখানি আয়না, ঠিক তার উপরেই কাচ ও ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো একখানা কাগজের উপরে লেখা রয়েছে এই পদ্যটি—

‘হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল, রইল বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল, রইল বাকি আট।
একটির পেট ফেটে গেল, রইল বাকি সাত।
হারাধনের সাতটি ছেলে গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে মল, রইল বাকি ছয়।
হারাধনের ছয়টি ছেলে চড়তে গেল গাছ,
একটি মল পিছলে পড়ে, রইল বাকি পাঁচ।

হারাধনের পাঁচটি ছেলে গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে, রইল বাকি চার।
একটি মল আছাড় খেয়ে রইল বাকি তিন।
হারাধনের তিনটি ছেলে ধরতে গেল রুই,
একটি খেলে বোয়াল মাছে রইল বাকি দুই।
হারাধনের দুইটি ছেলে মারতে গেল ভেক,
একটি মল সাপের বিষে, রইল বাকি এক।
হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল, রইল না আর কেউ!'

স্বপ্না বললে, আরে, এ-ছড়াটা আমি তো ছেলেবেলায় পড়েছি! কিন্তু এই ছেলেভুলানো ছড়াটা এখানে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কেন?

জিজ্ঞাসার কোনো জবাব পাওয়া গেল না। স্বপ্না আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সামনে দেখা যাচ্ছে ওই সমুদ্র—অসীম সমুদ্র। ওদিকে তাকালেই তার মনের পটে ফুটে ওঠে একটা দুঃস্বপ্নের দৃশ্য! সমুদ্রকে এখন দেখাচ্ছে বেশ শান্ত, কিন্তু সময়ে সে কী অধীর আর নিষ্ঠুর হয়েও ওঠে। সে তোমাকে টেনে নিয়ে যায় অতলে, তারপর মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে তরুণ ও জীবন্ত দেহ। মানুষ ডুবে যায়, তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় চিরকালের মতো।

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, না, না, আর সে কথা স্মরণ করব না, মুছে যাক অতীতের স্মৃতি—জেগে থাক বর্তমান।

ডাক্তার বোস বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়ালেন জলের ধারে। লাঞ্চখানা তখন একটু তফাতে নোঙর করা ছিল। ইব্রাহিম ডাঙা থেকে আবার

নৌকায় উঠতে যাচ্ছে, ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ির ভেতরে আসবে না?

ইব্রাহিম বললে, না হুজুর, আমাকে আবার এখনই ফিরে যেতে হবে।

—কেন?

—মনিব যদি পোর্ট ক্যানিং-এ এসে পৌঁছোন, তাকে তো আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে?

—মনোতোষবাবুর মোটরবোটখানা কোথায় গেল?

—তার ড্রাইভার সেখানা নিয়ে চলে গেছে। সে ফিরে আসবে আবার এক মাস পরে।

—এক মাস পরে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই রকম হুকুমই সে পেয়েছে।

ডাক্তার বোস অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, তাহলে মনোতোষবাবু এই দ্বীপে কিছুকালের জন্যে কায়েমি হয়ে বাস করতে চান? ভালো! কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। তাহলে কলকাতায় রোগীমহলে হাহাকার পড়ে যাবে, আর আমারও ব্যাঙ্কের খাতায় জমার ঘরে বিরাজ করবে দারিদ্র্য। পায়ে পায়ে তিনি আবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। খানিক পরেই শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন, মোটরলাঞ্চ আবার ছেড়ে দিলে। ডাক্তার বোসের মনে হল দেশের মাটির সঙ্গে যে শৃঙ্খলের যোগ ছিল, আবার তা ছিন্ন হয়ে গেল। এখন এই দ্বীপময় জগতে তারা ছাড়া আর কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না।

বাড়ির সামনের চাতালে ইজিচেয়ারের উপরে অর্ধশয়ান হয়ে আছেন চন্দ্রকান্ত চৌধুরি। ওই মিশরের মমির মতো শুষ্ক শীর্ণ দেহ, ওই কচ্ছপের মতো গলদেশ, ওই ব্যাঙের মতো মুখ, ওই কুঁজোর মতো সামনে দুমড়ে-পড়া দেহ আগে তিনি কোথায় দেখেছিলেন, এতক্ষণ স্মরণে আসছিল না। এইবারে মনে পড়েছে! উনি হচ্ছেন হাইকোর্টের জজ চন্দ্রকান্ত। তাকে একবার ওর কোর্টে গিয়ে

সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। অতিশয় হৃদয়হীন—লোকে ওঁর নাম রেখেছিল ফাসুড়ে জজ। প্রায় পৃথিবীর বাইরে এসে এমন জায়গায় আজ তার সঙ্গে দেখা!

চন্দ্রবাবু আপন মনে বললেন, ডাক্তার বোসকে দেখেই চিনেছি। লোকটা একবার আমার কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। খুব সচেতন সাক্ষী, নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। কিন্তু রাবিশ, ডাক্তার মাত্রই হচ্ছে নির্বোধ।

এ বাড়িতে আমরা সবাই পুরুষ, মেয়ে আছে কেবল দুজন। তাদের একজন হচ্ছে স্বল্পবাক, প্রাচীনা; আর-একজন একালের হাল-ফ্যাশনের মেয়ে। না, আরও একটি স্ত্রীলোক আছে, ওই সত্যবালা। অদ্ভুত জীব, সর্বদাই যেন ভয়ে তটস্থ।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে স্নানঘরে বসে স্নান করছে মনোতোষ। স্নান করতে ভারী ভালো লাগছিল তার। ধনীর ছেলে, যাপন করছে উৎসবময় জীবন, চন্দ্রলোক ছাড়া অন্ধকারের কোনো ধারই ধারে না!

হঠাৎ সে বলে উঠল, অবশেষে সামুদ্রিক দ্বীপে। এর মধ্যেই পৃথিবীকে আমি সব দিক দিয়ে উপভোগ করে নিয়েছি, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে নূতন! মোটরবোটকে আসতে বলে দিয়েছি এক মাস পরে। তার আগে এখান থেকে আমি ফেরবার নামও মুখে আনব না।

মহেন্দ্র নিজের ঘরে একখানা চেয়ারে বসে ভাবছে, আমার অভিনয়টা ঠিক হচ্ছে তো? মনে হয়, কেউই যেন আমাকে দেখে পছন্দ করছে না। কিন্তু কেবল আমি কেন, সকলেই সন্দেহ-ভরা চোখে তাকাচ্ছে সকলের দিকে। তবে আমি যে আসলে কে, সেটা বোধহয় কেউ ঠাহর করতে পারেনি। যাহোক আমার কাজ করতে হবে খুব সাবধানে।

তারও ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সেই ছেলেভুলানো ছড়াটি। সেই দিকে তাকিয়ে তার চোখ উঠল চমকে!

এর মানে কী?

চেয়ারের উপর উপবিষ্ট মেজর সেনের দুই ভুরু সঙ্কুচিত।

—রাবিশ! সবটাই যেন আজব কারখানা! অস্বাভাবিক অনুপস্থিত গৃহকর্তার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে অতিথিরা! গৃহকর্তা যে কে, তারও হদিস কেউ দিতে পারছে না।

এ-রকমটা আমি আশা করিনি। যে-কোনো একটা ছুতো তুলে এখান থেকে সরে পড়তে হবে কোনোরকমে। কিন্তু এই ঘরে বসেই তো দেখতে পেয়েছি, মোটরবোট আর মোটরলাঞ্চ দ্বীপ ছেড়ে আবার চলে গিয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেও আর পালাবার জো নেই। চারিদিকে সমুদ্র! আমরা বন্দি!

আর ওই অমলেন্দু লোকটা কে? নিশ্চয়ই ভালো লোক নয়। দেখলেই সন্দেহ হয়!

অমলেন্দু ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পা টিপে টিপে। তাকে দেখলেই মনে হয়, শিকারের সন্ধান পেয়ে একটা চিতে বাঘ যেন চলছে-ফিরছে অত্যন্ত সন্তপর্ণে!

হঠাৎ মৃদু হেসে মনে মনে সে বললে, 'অ্যাটর্নি বিজন বোসের মুখে শুনলুম, আমার মেয়াদ এখানে এক সপ্তাহের বেশি নয়।

উত্তম! আমি পরিপূর্ণমাত্রায় উপভোগ করব সেই এক সপ্তাহ?

সৌদামিনী সোজা মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন, তার দৃষ্টি নিবন্ধ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো সেই ছেলেভুলানো ছড়ার দিকে।

শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, বোধহয় আমি কোনো পাগলাগারদে এসে পড়েছি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রের আহারের জায়গা হল বৈঠকখানার পাশের ঘরে।

খাবারের আয়োজন হয়েছিল প্রায় ভুরিভোজনের মতো। নিত্যানন্দ যেন একই অনেকজন। তার পরিবেশনে সবাই পরিতুষ্ট।

আহারাদির পর সকলেই আবার বৈঠকখানায় এসে বসল। ভোজনের পর চন্দ্রবাবুর খিটখিটে মেজাজ কতকটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি কোনো কোনো প্রসঙ্গ তুললেন, ডাক্তার বোস ও মেজর সেন তার কথা শুনতে লাগলেন ।

স্বপ্না বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনি তো সিংহলপ্রবাসী শুনলুম। ওখানকার গল্প বলুন।

মহেন্দ্র তার কৌতুহল নিবারণের চেষ্টায় নিযুক্ত হল।

অমলেন্দু তার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে বসল। তারপর তার সতর্ক দৃষ্টি ফিরতে লাগল এর-ওর-তার মুখের উপর।

সৌদামিনী চেয়ারের উপরে কাঠের পুতুলের মতো স্থির। তিনি সকলের কথা শুনতে লাগলেন, কিন্তু নিজে একটিও বাক্য উচ্চারণ করলেন না।

মনোতোষ চেঁচিয়ে বললে, নিত্যানন্দ, এখানে আইসক্রিম সোড়া থাকে তো আমায় একটা এনে দাও।

এখানকার কথাবার্তা তার ভালো লাগছিল না। সে উঠে জানলার কাছে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ল।

নিত্যানন্দ একটা গেলাসে আইসক্রিম সোডা ভরে তার সামনে এনে রাখলে।

মনোতোষ বললে, আইসক্রিমের আর একটা বোতল আর চাবি টেবিলের উপর রেখে দাও। দু-গ্লাস না খেলে আমার তেষ্টা মিটবে না।

গেলাসে বার-দুয়েক চুমুক দিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে মনোতোষ সচমকে বলে উঠল, আরে এ কী ব্যাপার!

মনোতোষের কথা শুনে সকলেই মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে। অমলেন্দু সবিস্ময়ে বললে, 'টেবিলের উপরে সাজানো ওই মূর্তিগুলো কীসের? দশ দশটা মূর্তি।

চন্দ্রবাবু ও সৌদামিনী ছাড়া আর সবাই উঠে সেই টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, এগুলো হচ্ছে সেই ছেলেভুলোনো ছড়ার মূর্তি। হারাধনের দশটি ছেলে!

স্বপ্না বললে, এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি! ওই বাঁধানো ছড়াটা আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে!

তারপর অন্য সকলেও বললে সেই একই কথা। সকলেরই ঘরে টাঙানো আছে ওই ছড়াটা।

চন্দ্রবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার।

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিস্তব্ধ রাত্রে বাহির থেকে ভেসে আসতে লাগল সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহল।

সৌদামিনী বললেন, সমুদ্রের সাড়া রাত্রে শোনায় চমৎকার।

স্বপ্না তিক্তকণ্ঠে বললে, সমুদ্রের শব্দকে আমি ঘৃণা করি!

সৌদামিনী একটু বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তারপর আবার স্তব্ধতা। তারপর সমুদ্রের কোলাহল ডুবিয়ে ঘরের ভিতরে আচম্বিতে জাগ্রত হল আর-এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! সে যেন অমানুষিক কণ্ঠস্বর...

—ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! সকলে চুপ করে আমার কথা শুনুন!

প্রত্যেকেই অত্যন্ত চমকে উঠল। সকলে চারিদিকে তাকাতে লাগল—চার দেওয়ালের দিকে, পরস্পরের মুখের দিকে। কে কথা কইলে, কোথা থেকে আসছে এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর?

সেই অজানা কণ্ঠে স্পষ্ট, উচ্চস্বরে শোনা গেল...

তোমাদের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে অভিযোগ...

ডাক্তার ভবনাথ বসু। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মার্চ তারিখে তুমি লতিকা রায়চৌধুরিকে হত্যা করেছ।

সৌদামিনী দেবী, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে তোমার জন্যে অমলাদেবী মারা পড়েছেন।

মহেন্দ্রকুমার মিত্র, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে জ্যোতির্ময় বসুর মৃত্যু হয়েছে তোমার জন্যেই।

স্বপ্না দেবী, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ই আগস্ট তারিখে কুমার নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নীরেন্দ্রনারায়ণকে তুমি হত্যা করেছ।

অমলেন্দু মল্লিক, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক তারিখে সিংহলের বিজন অরণ্যে ২১ জন মানুষের মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী।

মেজর মন্মথমোহন সেন, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে তুমি তোমার স্ত্রীর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ পালকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছ।

মনোতোষ চৌধুরি, গত বৎসরের নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে তুমি সুকুমার ও তার ভগ্নী অতসীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

নিত্যানন্দ দাস ও সত্যবালা দাসী, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে নিস্তারিণী দেবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন তোমাদের জন্যেই।

চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে বরেন্দ্রনাথ বসুকে তুমি মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছ।

আজ তোমরা এখানে বন্দি। নিজেদের স্বপক্ষে তোমাদের কিছু বলবার আছে?

স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ সবাই স্তম্ভিত ও নির্বাক। তারপরই হুড়মুড় করে কতকগুলো কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ হল।

নিত্যানন্দ একখানা ট্রের উপরে কয়েকটা ভরতি কফির পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল, হঠাৎ তার হাত ফসকে ট্রেখানা সশব্দে পড়ে গেল মেঝের উপরে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের বাহির থেকে শোনা গেল একটু উচ্চ আর্তনাদ ও ধপাস করে একটা দেহ পতনের শব্দ।

সর্বপ্রথম সাড়া হল অমলেন্দুর। সে এক লাফে এগিয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাহিরে দরজার ঠিক সামনেই অচেতন হয়ে পড়ে আছে সত্যবালার দেহ।

অমলেন্দু ডাকলে, মনোতোষবাবু!

মনোতোষ তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেল এবং দুইজনে ধরাধরি করে সত্যবালার দেহ বৈঠকখানায় নিয়ে এসে একখানা সোফার উপর শুইয়ে দিলে।

ডাক্তার বোস সত্যবালাকে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, কোনো ভয় নেই, অজ্ঞান হয়ে গেছে, এখুনি জ্ঞান হবে।

স্বপ্না চেঁচিয়ে বলে উঠল, ও কে কথা কইলে? কোথায় সে?

মেজর সেন বললেন, এ সব কী ব্যাপার? কেউ কি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চায়? তার হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। তাকে দেখলে মনে হয়, তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গিয়েছে!

মহেন্দ্রর সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছিল, রুমাল বার করে সে মুখ মুছতে লাগল। কেবল চন্দ্রবাবু ও সৌদামিনী এমন স্থির ভাবে বসেছিলেন, যেন এখানে অসাধারণ কোনো কিছুই ঘটেনি।

অমলেন্দু বললে, মনে হচ্ছে, এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েই এইমাত্র ওই কথাগুলো কেউ উচ্চারণ করেছে।

স্বপ্না বললে, কিন্তু কে সে? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ নয়?

অমলেন্দুর চোখ একবার ঘরের খোলা জানালার দিকে আকৃষ্ট হল। তারপর সে মাথা নাড়লে নিশ্চিতভাবে, না—ওখান থেকে কেউ কথা বলেনি।

ঘরের আর-একদিকে আর-একটা দরজা দিয়ে পাশের অন্য-একটা ঘরের ভিতরে যাওয়া যায়। অমলেন্দু ধাক্কা মেরে সেই দরজাটা খুলে ফেলে ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল, ও, এইবারে বোঝা গেছে।

সকলে তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল সৌদামিনী সিধে হয়ে স্থিরভাবে বসে রইলেন নিজের চেয়ারের উপরে। ও-ঘরের দেওয়াল ঘেষে দাঁড় করানো আছে একটা টেবিল এবং সেই টেবিলের উপরে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা চোঙায়ালা সেকেলে গ্রামোফোন। চোঙার মুখটা স্পর্শ করে আছে বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালকে ।

অমলেন্দু চোঙাটা ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল, দেওয়ালের উপরে রয়েছে ছোটো ছোটো তিন-চারটে ছিদ্র।

অমলেন্দু গ্রামোফোনের সাউন্ড বক্সটা রেকর্ডের যথাস্থানে স্থাপন করে আবার কল চালিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল—ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! সকলে চুপ করে আমার কথা শুনুন!

স্বপ্না চেঁচিয়ে উঠল, বন্ধ করে দিন—মেশিন বন্ধ করে দিন! এ হচ্ছে ভয়ানক?

অমলেন্দু মেশিন বন্ধ করে দিল। ডাক্তার বোস আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, এ হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই নির্দয় ঠাট্টা! অত্যন্ত অপমানকর!

পরিষ্কার স্বরে চন্দ্রবাবু, আপনি তাহলে একে ঠাট্টা বলেই মনে করছেন!

ডাক্তার ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, তা ছাড়া আর কী মনে করতে পারি?

চিবুক চুলকোতে চুলকোতে চন্দ্রবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, আপাতত আমি কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না।

মনোতোষ বললে, কিন্তু আপনারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। এই মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছে কে?

চন্দ্রবাবু বললে, হ্যাঁ, এইবারে সেই কথা নিয়েই আলোচনা করতে হবে। চলুন, আবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

সত্যবালার তখন জ্ঞান হয়েছে। সে ক্রন্দন করছিল অস্ফুট স্বরে। তার পাশে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিলেন সৌদামিনী।

নিত্যানন্দ কাছে গিয়ে সৌদামিনীকে সম্বোধন করে বললে, আপনি দয়া করে সরে বসুন। আমাকে ওর সঙ্গে কথা কইতে দিন। সত্য, তুমি কাঁদছ কেন? চুপ করো, শান্ত হও।

সত্যবালা উদ্ভ্রান্ত চোখে সকলকার দিকে তাকাতে লাগল। ডাক্তার সান্ত্বনা কণ্ঠে বললেন, কেঁদো না সত্যবালা, তোমার আর কোনো ভয় নেই।

—হ্যাঁ।

পাণ্ডুমুখে কম্পিতস্বরে সে বললে, ওই কণ্ঠস্বর—ওই ভয়ানক কণ্ঠস্বর—ঠিক যেন বিচারক রায় দিচ্ছেন আসামিদের প্রতি—

নিত্যানন্দ বললে, হ্যাঁ, আমিও এমন চমকে গিয়েছিলুম যে আমার হাত থেকে ট্রেখানা পড়ে গেল। ওসব হচ্ছে মিথ্যাকথা—একেবারে বাজে মিথ্যাকথা!

চন্দ্রবাবু দু-এক বার কেশে নিজের গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, গ্রামোফোনের মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছিল কে? তুমিই কি?

নিত্যানন্দ চিৎকার করে বলে উঠল, ও রেকর্ডে কী আছে আমি তা জানতুম না! ভগবানের দিব্য, আমি কিছুই জানতুম না! জানলে পরে আমি কিছুতেই একাজ করতুম না!

চন্দ্রবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন, তোমার কথা আমি সত্য বলেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেশিনটা তুমি চালিয়ে দিয়েছিলে কেন?

—আমি মনিবের হুকুম তামিল করতে বাধ্য।

—কে তোমার মনিব?

—কে যে আমার মনিৰ তাও আমি জানি না। তবে অ্যাটনি বিজনবাবুর মুখেই আমি তার হুকুম শুনেছি।

—হুকুমটা কী, নিত্যানন্দ?

—আমাকে ওই রেকর্ডখানা মেশিনের উপরে রাখতে হবে। তারপর রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমি যখন কফির ট্রে হাতে করে বৈঠকখানায় আসব, আমার স্ত্রী তখন মেশিনটা চালিয়ে দেবে।

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, আশ্চর্য কথা!

নিত্যানন্দ আবার চেঁচিয়ে বললে, কিন্তু আশ্চর্য হলেও আমি সত্য কথাই বলছি। ওই রেকর্ডের উপরে একটা নামও লেখা আছে। আমি ভেবেছিলুম, ওখানা কোনো গানের রেকর্ড।

অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, এই রেকর্ডের উপরে কোনো নাম লেখা আছে নাকি?

অমলেন্দু ম্লান হাসি হেসে বললে, আছে, মশাই, আছে। রেকর্ডের উপরে লেখা আছে—‘সর্বশেষের গান’!

মেজর সেন উত্ত্যক্ত কণ্ঠে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে রাবিশ! সকলের নামেই এইরকম বাজে অভিযোগ করা! কে এই বাড়ির মালিক? অ্যাটনি বিজন বোসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

সৌদামিনী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, কে এই বাড়ির মালিক?

জজ চন্দ্রকান্তবাবু, চিরকালই হুকুম দেওয়া ছিল তার পেশা। সেই রকম হুকুমের স্বরেই তিনি বললেন, হুঁ, এইবারে ওই কথাটাই জানা দরকার। নিত্যানন্দ, তুমি আগে তোমার স্ত্রীকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। তারপর আবার ফিরে এসো।

নিত্যানন্দ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর তার কাধে ভর করে সত্যবালা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলেরই কণ্ঠস্বর শুকিয়ে গিয়েছিল। মনোতোষ বললে, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আপনারাও কিছু পান করবেন নাকি?

সবাই বললে, হ্যাঁ।

মনোতোষ বললে, পাশের ঘরে একটা সেলফের উপরে আমি অনেকগুলো সোডা-লেমোনেডের সাজানো বোতল দেখে এসেছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।

নিত্যানন্দ আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। চন্দ্রবাবু বললেন, তা হলে নিত্যানন্দ, এ বাড়ির মালিক কে, তুমি তা জানো না?

—আজ্ঞে না। আমি তাকে দেখিওনি, তার নামও শুনিনি। আমাকে নিযুক্ত করেছেন অ্যাটনি বিজনবাবু।

চন্দ্রবাবু বললেন, অ্যাটনি বিজন বসু?

হুঁ, ও নাম আমার পরিচিত। তারপর নিত্যানন্দ, তোমার আর কী বক্তব্য আছে?

—আপনারা আসবার দু-দিন আগে আমরা দুজনে এখানে এসেছি। দেখলুম, সাজানো-গুছানো বাড়ি, ভাড়ার ঘর খাবারে ভরতি। কোথাও কিছুরই অভাব নেই।

—তারপর?

—তারপর আর বলবার কথা বিশেষ কিছুই নেই। তারপর আমি একখানা চিঠি পাই। তাতেই লেখা ছিল, আমাকে কী কী করতে হবে।

—সে চিঠিখানা তোমার কাছে আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই নিন। নিত্যানন্দ পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চন্দ্রবাবুর হাতে দিলে।

চন্দ্রবাবু চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, চিঠিখানা দেখছি টাইপ করা। লেখকের ঠিকানা হচ্ছে কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল।

মহেন্দ্র টপ করে এগিয়ে এসে চিঠিখানা টেনে নিয়ে বললে, আমাকে একবার চিঠিখানা দেখতে দিন। তারপর কাগজখানার উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ করে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, আন্ডারউড টাইপরাইটার! নতুন যন্ত্র—কোনো টাইপ ক্ষয়ে যায়নি। সাধারণ টাইপ করার কাগজ। এর ভিতর থেকে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করা চলবে না। হয়তো আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

চন্দ্রবাবু হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মহেন্দ্রের দিকে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আশ্চর্য আপনার নাম তো এখনও আমরা জানতে পারিনি?

মহেন্দ্র থতমত খেয়ে একটু থেমে বললে, আমার নাম?

আমার নাম নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি।

চন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, এইমাত্র গ্রামাফোনের রেকর্ডের সাহায্যে সকলকার নামে কোনো ব্যক্তি গুরুতর অভিযোগ

করেছে। নরেনবাবু, আপনি ছাড়া অভিযোগ হয়েছে আর-সকলের বিরুদ্ধেই। না, ঠিক সকলের বিরুদ্ধে নয়, অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন মহেন্দ্রকুমার মিত্র নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি কে? তিনি তো এখানে উপস্থিত নেই?

মহেন্দ্র নাচারভাবে বললে, দেখছি, আত্মপ্রকাশ করা ছাড়া আমার পক্ষে আর কোনো উপায় নেই। চন্দ্রবাবু, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি নয়।

—তা হলে আপনারই নাম কি মহেন্দ্রকুমার মিত্র?

—আজ্ঞে হ্যা।

অমলেন্দু তপ্তকণ্ঠে বললে, আপনি কেবল নাম লুকিয়ে এখানে আসেননি। মিথ্যা কথা বলতেও আপনার বাধে না। আপনি নিজেকে সিংহলপ্রবাসী বলে জানাতে চান। সিংহলে আমি অনেকবার গিয়েছি। একটু আগেই আপনার মুখে সিংহলের যে-সব গল্প শুনছিলুম, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আপনি ওরকম বাজে গল্প বলতে পারতেন না। কে আপনি?

সকলের দৃষ্টি গেল মহেন্দ্রর দিকে—ক্রুদ্ধ, সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি। মনোতোষ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে, তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। খাপ্পা হয়ে সে বললে, কে তুমি, নাম আর পরিচয় লুকিয়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছ?

মহেন্দ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হল না, শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আপনারা সকলেই আমাকে ভুল বুঝেছেন দেখছি। আমার পরিচয়ও আমি দিতে পারি আর তার প্রমাণও আমি দেখাতে পারি। আমি আগে ছিলুম পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে, এখনও প্রাইভেট ডিটেকটিভে'র কাজ করি। কোনো ব্যক্তি এই দ্বীপে আসবার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, কোনো ব্যক্তি মানে? কে সে?

—পিছনে কে আছেন আমি তা জানি না, কিন্তু আমাকে নিযুক্ত করেছেন অ্যাটনি বিজন বোস। তারই কথামতো আমিও একজন অতিথিরূপে এখানে

এসেছি। আমার কর্তব্য হচ্ছে, আপনাদের সকলেরই উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য আমি যথেষ্ট পারিশ্রমিকও পেয়েছি।

—আমাদের উপরে দৃষ্টি রাখবার কারণ?

—কাননকুন্তলা দেবী বলে কোনো মহিলার এখানে আসবার কথা। তাঁর গায়ে নাকি থাকবে লক্ষাধিক টাকার জড়োয়া গয়না। আসলে আমাকে পাহারা দিতে হবে তার জন্যেই। কিন্তু আমার কী বিশ্বাস জানেন? কাননকুন্তলা দেবী হচ্ছেন কাল্পনিক মহিলা, সুতরাং কোনোদিনই তিনি এখানে আসবেন না।

চন্দ্রবাবু বললেন, আপনার বিশ্বাস বোধহয় ভুল নয়।

স্বপ্না বলে উঠল, কিন্তু ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেন ডাহা পাগলামি! চন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, আমারও তাই মনে হয়। আমরা কোনো বিপজ্জনক পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলে না। তারপর চন্দ্রবাবু আবার ঘটনার সূত্র ধরে বললেন, এইবারে এর পরের কথা। আগে আমার নিজের বক্তব্যই বলি। প্রায় একযুগ আগে চারুশীলা দেবী নামে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তারই কাছ থেকে এক আমন্ত্রণলিপি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। এখন আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি যে ওই রকম কোনো আমন্ত্রণ-লিপি বা কোনো ওজর দেখিয়ে আপনাদেরও সবাইকে এই দ্বীপে ভুলিয়ে আনা হয়েছে। যার কথায় আজ আমরা এই ফাঁদে পা দিয়েছি, নিশ্চয়ই সে আমাদের পূর্ব-জীবনের সঙ্গে পরিচিত। সেই জন্যেই সে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহস করেছে।

মেজর সেন ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, মিথ্যা অভিযোগ—যাকে বলে একেবারে বাজে ধাপ্পা!

স্বপ্না বললে, এসব অভিযোগের কোনো মানেই হয় না।

নিত্যানন্দ প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, মিথ্যা কথা—রবিশ মিথ্যা কথা! আমরা কেউই নিশ্চয়ই কোনো অপকর্ম করিনি।

মনোতোষ গজরাতে গজরাতে বললে, যে এইসব অভিযোগ করেছে, সেই মিথুকটা কী বলতে চায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

চন্দ্রবাবু হাত তুলে সবাইকে শান্ত হবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই। আমাদের অজানা বন্ধু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, আমি নাকি বরেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আমি তখন হাইকোর্টের জজ ছিলুম। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমার কোর্টে বরেন্দ্রনাথ বসুকে বিচারের জন্যে আনা হয় — সে অভিযুক্ত হয়েছিল কোনো স্ত্রীলোককে হত্যা করার জন্যে। তার পক্ষে ছিলেন একজন বিখ্যাত

ব্যারিস্টার, তিনি এমন সুকৌশলে তার পক্ষ সমর্থন করলেন যে জুরিরা প্রথমটা সায় দিলেন তার কথাতেই। কিন্তু প্রমাণাদি দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, বরেনই হচ্ছে অপরাধী। জুরিদের শুনিয়ে সেই সব কথা আমি যখন বললুম, তারা তখন আমার কথারই সমর্থন করলেন, দোষী বলেই সাব্যস্ত হল বরেন বসু। আমি দিলুম তাকে মৃত্যুদণ্ড। সে পরে আপিল করেছিল, কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। বরেন বসুর ফাঁসি হয়। আমার সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি— আমার পক্ষে গোপন করবার কিছুই নেই। আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি এক হত্যাকারীকেই।

ডাক্তার বোসেরও মনে পড়ে গেল আগেকার কথা। বরেন বসুর মামলা। বিচারকের রায় শুনে সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। রায় দেবার আগে বরেনের পক্ষের ব্যরিস্টার তাঁর কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, আসামি নিশ্চয়ই খালাস পাবে। কিন্তু তার প্রাণদণ্ডের হুকুম হবার পর সে বলে, আসামির উপরে জজের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। আইনে জজ চন্দ্রকান্ত একজন পাকা লোক, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তিনি অবিচার করেননি বটে, কিন্তু বিচার করেছিলেন নিতান্ত নির্দয়ভাবে, সেইজন্যেই আসামি মুক্তি পেলে না।

ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসা করলেন, চন্দ্রবাবু, ওই মামলার আগে আপনি বরেন বসুকে চিনতেন?

চন্দ্রবাবুর সরীসৃপের মতো ক্রুর দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর স্থির হয়ে রইল এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে। তারপর তিনি বললেন, না, আগে আমি তাকে চিনতুম না।

ডাক্তার নিজের মনে মনে বললেন, লোকটা যে মিছে কথা বলছে, ওর মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

স্বপ্না কম্পিত স্বরে বললে, আমারও কিছু বক্তব্য আছে। নীরেন্দ্রনারায়ণ নামে একটি নয়-দশ বছরের বালককে লালন-পালন করবার ভার ছিল আমার

উপরে। একদিন তাকে নিয়ে পুরীর সমুদ্রে আমি স্নান করতে নেমেছিলুম। সেই সময়ে আমার অজান্তেই হঠাৎই সে সাঁতার কাটতে কাটতে খানিক দূর এগিয়ে যায়। পরে তাকে দেখতে পেয়ে আমিও সাঁতার কেটে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম বটে, কিন্তু তার নাগাল ধরতে পারিনি। নীরেন ডুবে যায়। আমার কোনোই দোষ ছিল না। করোনারও তা স্বীকার করেছিলেন। তার বাবা কুমার নরেন্দ্রনারায়ণও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। তবে এতদিন পরে আমার বিরুদ্ধে এই ভয়ানক অভিযোগ আনা হয়েছে কেন? এ অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়? বলতে বলতে তার দুই চক্ষু পূর্ণ হয়ে উঠল অশ্রুজলে।

মেজর সেন তার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললেন, কাতর হবেন না স্বপ্না দেবী! নিশ্চয় এ অভিযোগ মিথ্যা। পাগল ছাড়া আর কেউ এমন কথা বলতে পারে না। সোজা ব্যাপারকে উলটে সে দেখবার চেষ্টা করেছে বিকৃতভাবে।

সঙ্গে সুরেনের আলাপ ছিল বটে। সে ছিল আমার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কীয় ভাই। কিন্তু কেন জানি না, আমাকে সে দু-চক্ষে দেখতে পারত না—অবশ্য এটা আমি জানতে পেরেছিলুম পরে। আমার স্ত্রীকে সে দীর্ঘকাল ধরে গোপনে আমার বিরুদ্ধে এমন উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, অবশেষে স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, আমাকেও যেতে হয় উত্তর-আফ্রিকার রণক্ষেত্রে। সুরেন ছিল আমার অধীনে এক লেফটেন্যান্ট। একদিন খবর পাই, একদল ইতালীয় সৈন্য অতর্কিত আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে আছে। কয়েকজন সেপাইয়ের সঙ্গে সুরেনকে সেই খোঁজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিই। তারপর সে মারা পড়ে। এ হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ ঘটনা, এর জন্যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

এইবারে কথা কইলে অমলেন্দু। তার চক্ষে কৌতুকের ইঙ্গিত। সে বললে, যে তামিল লোকগুলোর মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করা হয়েছে—

মনোতোষ শুধোলে, তামিল লোকগুলো মানে?

অমুলেন্দু হাসিমুখেই বললে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। সিংহলের বিজন অরণ্যে একবার আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সর্বসমেত দলে আমরা ছিলুম বাইশজন লোক—আমি ছাড়া আর সবাই জাতে তামিল। হয়তো সেই নিবিড় অরণ্যে পথ হারিয়ে আমিও মারা পড়তুম, কারণ আমাদের সঙ্গে যে খাবার ছিল, বাইশ জন লোক মিলে খেলে তা ফুরিয়ে যেত তিন দিনেই। কাজেই লুকিয়ে সেই খাবারগুলো নিয়ে এক রাত্রে আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম।

অমলেন্দু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়েই বললে, লোকালয়ে বসে আমার এই আচরণকে খুব সঙ্গত বলে মনে হবে না বটে। কিন্তু উপায় কী? আত্মরক্ষার চেষ্টা হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম পথ হারিয়ে সেই অপ্রচুর খোরাক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে থাকলে আমাদের সকলকেই মারা পড়তে হত নিশ্চয়ই! কিন্তু পালিয়ে এসেছি বলে বেঁচে গিয়েছি আমি—বাকি সবাই হয়তো সত্য সত্যই মারা পড়েছে।

মনোতোষ বললে, তাহলে আমার কথাও শুনুন। সুকুমার আর তার বোন অতসীকে দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন আমার মোটরগাড়ির তলায় পড়ে মারা পড়তে হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, দুর্ভাগ্যটা কার—আপনার, না তাদের?

—আমারও, তাদেরও; কিন্তু এ হচ্ছে আকস্মিক দুর্ঘটনা। অবশ্য এই দুর্ঘটনার ফলে আমার গাড়ি চালাবার লাইসেন্স এক বছরের জন্য বাতিল করা হয়েছিল বটে।

নিত্যানন্দ বাধো বাধো গলায় বললে, আমি কি দু-একটা কথা বলতে পারি?

চন্দ্রবাবু বললেন, নিশ্চয়ই বলতে পারো।

নিত্যানন্দ বললে, আমাকে আর আমার স্ত্রীকে দায়ী করা হয়েছে নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যুর জন্যে। নিস্তরিণী দেবীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর, আত্মীয়স্বজন বলতে তাঁর কেউ ছিল না। তার পরিচর্যার ভার ছিল আমাদের দুজনেরই উপরে। তার স্বাস্থ্য একেবারেই ভালো ছিল না, তিনি বাস করতেন তার মফস্সলের বাড়িতে। এক রাত্রে হঠাৎ তার ভীষণ জ্বর হয়—জ্বরের মাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। সে-এক বিষম দুর্যোগের রাত, প্রবল ঝড়ের সঙ্গে এসেছিল প্রচণ্ড বন্যা। সে গ্রামে ডাক্তার ছিল না, ডাক্তার থাকতেন ভিন্ন গ্রামে, প্রায় আট মাইল দূরে। তবুও আমি সেই ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার ভিতরেই পায়ে হেঁটে ডাক্তারের বাড়ি যাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয়নি। নিস্তারিণী দেবী মারা যান শেষ রাত্রে।

মহেন্দ্র কতকটা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল, নিস্তারিণী দেবী পরলোকে যান, ইহলোকে ফেলে অল্পবিস্তর সম্পত্তি, কী বলো নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ বললে, নিস্তারিণী দেবী বেঁচে থাকতেই আমাদের তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। এ জন্যে কেউ কোনোই অভিযোগ করতে পারে না। পুলিশও অভিযোগ করেনি।

অমলেন্দু বললে, মহেন্দ্রবাবু, অভিযুক্তদের তালিকায় আপনার নামও আছে।

মহেন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, জানি, আমার জন্যেই নাকি জ্যোতির্ময় মারা পড়েছে। জ্যোতির্ময় ছিল একদল ডাকাতের দলপতি। সদলবলে সে এক ব্যাঙ্কের ওপর গিয়ে হানা দেয়। তারই রিভলভারের গুলিতে মারা পড়ে ব্যাঙ্কের দারোয়ান, কিন্তু পালাবার আগেই পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে। তখন আমি গোয়েন্দাবিভাগে, এই মামলাটা পড়ে আমার হাতেই। তদন্ত করে আমি যে রিপোর্ট দিই, সেই অনুসারেই জ্যোর্তিময়ের হয় মৃত্যুদণ্ড। আমি নিজের কর্তব্যপালন ছাড়া আর কিছুই করিনি।

অমলেন্দু খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, ওঃ, এখানে আমি ছাড়া আর সকলেই কী কর্তব্যপরায়ণ! তারপর ডাক্তারবাবু, এখনও আপনার কথা শোনা হয়নি। কর্তব্যপালন করতে গিয়ে আপনিও কি কোনোদিন বেহিসেবি কাজ করে ফেলেননি? লতিকা রায়চৌধুরি মারা পড়েছেন কেন?

ডাক্তার কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না, বেশ শান্তস্বরেই বললেন, 'ভালো করে আমার কিছুই মনে পড়ছে না। অভিযোক্তার মতে, ঘটনাটা ঘটেছিল বিশ বৎসর আগে। লতিকা দেবী কে? জীবনে শতশত রোগী দেখেছি, এতদিন পরে লতিকা দেবীকে আমি স্মরণ করতে পারছি না। আমি হচ্ছি সার্জন, খুব সম্ভব অস্ত্রোপচারের ফলে লতিকা নামে কোনো নারী মারা পড়ে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে দায়ী করাই হচ্ছে সাধারণ লোকের স্বভাব। এ ছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই।

কিন্তু তিনি নেজর মনে মনে বললেন লতিকার নাম এ জীবনে আমি ভুলতে পারব না। তখন মদ্যপান করতুম। সেদিন অস্ত্রোপচারের সময়ে আমি ছিলুম বেহেড মাতাল। আমার হাত এত কাঁপছিল যে, ভালো করে ছুরিই ধরতে পারছিলুম না। হয়তো আমার দোষেই লতিকা মারা পড়েছে। কিন্তু বিশ বৎসর আগেকার সেই দুঃস্বপ্ন, আজ এতদিন পরে আবার আমার সামনে টেনে আনতে চেয়েছে কে?

প্রত্যেকেরই বক্তব্য শেষ হল, কেবল সৌদামিনী দেবী ছাড়া। সকলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে লাগল তার মুখের দিকে।

সৌদামিনী দুই ভুরু কুঁচকে বললেন, আপনারা কি আমার মুখ থেকেও কিছু শুনতে চাইছেন? আমার কোনো বক্তব্যই নেই।

চন্দ্রবাবু বললেন, কোনো বক্তব্যই নেই?

—কিছু না।

—আপনি কি এর পরে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন?

—আমি কোনো পক্ষই সমর্থন করব না। আমি যখনই যা করেছি, নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই করেছি। আমার মনে কোনো পাপ নেই। সৌদামিনীর ওষ্ঠ ও অধর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হল পরস্পরের সঙ্গে।

চন্দ্রবাবু দু-তিন বার কেশে নিজের কণ্ঠকে আবার পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বলেন, আপাতত, আমাদের তদন্ত এইখানেই শেষ হল। নিত্যানন্দ, এই দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ আছে?

—কেউ না, একেবারেই কেউ না।

চন্দ্রবাবু গলা আর-একটু তুলে বলেন, কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি কী জন্যে আমাদের এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছে, তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে তার মস্তিষ্ক যে বিকৃত, এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই! হয়তো সে হচ্ছে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। আমার মত হচ্ছে, অবিলম্বেই এই দ্বীপ ত্যাগ করা উচিত। আজ রাত্রেই।

নিত্যানন্দ বললে, কিন্তু হুজুর, কীসে করে যাবেন? সেই মোটরলাঞ্চ আর বোট দুখানাই এখান থেকে চলে গিয়েছে। শুনেছি, ইব্রাহিম কালকেই আবার এই দ্বীপের মালিককে নিয়ে ফিরে আসবে।

—তাহলে আমাদের কাল পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে।

মনোতোষ ছাড়া আর-সকলেই সায় দিলে এই প্রস্তাবে। মনোতোষ বললে, সেটা হবে কাপুরুষের কাজ। এখান থেকে চলে যাবার আগে সমস্ত রহস্যটা আমি তলিয়ে বুঝতে চাই। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে ঠিক যেন ডিটেকটিভ গল্পের মতো অত্যন্ত রোমাঞ্চকর!

চন্দ্রবাবু তিক্তস্বরে বললেন, আমার এই বয়সে রোমাঞ্চকর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই।

মনোতোষ উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, আপনি হচ্ছেন বৃদ্ধ, আমি হচ্ছি যুবক, আমি চাই জীবন—রোমাঞ্চকর ঘটনাচঞ্চল বেগবান জীবন!

তারপর সে এগিয়ে গেল জানালার সামনের টেবিলটার দিকে। একটি গেলাসে ঢালা ছিল খানিকটা লেমোনেড। মনোতোষ গেলাসটা তুলে নিয়ে উর্ধ্বমুখে এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটাই পান করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে তার দম যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত মুখখানা হয়ে উঠল রক্তবর্ণ। সে জোর করে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করলে এবং পরমুহূর্তেই তার দেহ আর হাতের গেলাসটা মাটির উপরে আছড়ে পড়ল সশব্দে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঘটনাটা ঘটে গেল অত্যন্ত আচমকা। সকলেই শ্বাস রোধ করে নির্বোধের মতো মনোতোষের ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

তারপর ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিশ্চেষ্ট দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মনোতোষের বুকের উপরে একবার হাত রেখে বিভ্রান্ত চোখে সভয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, ভগবান! এ দেহে যে জীবনের কোনো লক্ষণই নেই!

কেউ যেন সে কথা বিশ্বাসই করতে পারলে না। জীবনের কোনো লক্ষণই নেই? মৃত? মূর্তিমন্ত তরুণ যৌবনের মতো মনোতোষ, অমন স্বাস্থ্য-সবল আদর্শ দেহ, এমন আচম্বিতে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হতে পারে কখনো?

না, বিশ্বাস করা অসম্ভব। ডাক্তার বোস মৃতের উপরে করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত। তারপর তার হাতের আধভাঙা গেলাসটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মেজর সেন শুধোলেন, মৃত? আপনি কি বলতে চান মনোতোষবাবুর দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে?

ডাক্তার বললেন, শ্বাস রোধ হওয়ার ফলে মনোতোষবাবু মারা পড়েছেন।

তিনি খুব সাবধানে গেলাসের ভিতরে যে কয়েক ফোটা পানীয় ছিল, আঙুলে করে তা তুলে নিয়ে একবার দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তার মুখের ভাব!

মেজর সেন বললেন, কোনো মানুষ যে এমনভাবে মারা পড়তে পারে আমার তা জানা ছিল না।

সৌদামিনী বললেন, জীবনের মধ্যেই আমরা পাই মৃত্যুর আলিঙ্গন।

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না, এমনভাবে বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ মারা পড়তে পারে না। মনোতোষবাবুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।

স্বপ্না প্রায় চুপি চুপি বললে, তাহলে ওই গেলাসের ভিতরে কি বিষটিষ কিছু ছিল?

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, তবে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না। মনে হচ্ছে সায়ানাইড'। প্রসিক অ্যাসিডের স্পষ্ট গন্ধ নেই, সম্ভব পোটাসিয়াম সায়ানাইড। মুহুর্তের মধ্যে কাজ করে।

চন্দ্রবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, বিষ কি গেলাসের ভিতরে ছিল?

—হ্যা।

অমলেন্দু বললে, আপনি কি বলতে চান, গেলাসের ভিতরে বিষ রেখেছিলেন মনোতোষবাবু নিজেই?

—তা ছাড়া আর কী বলব?

মহেন্দ্র বললে, আত্মহত্যা? আশ্চর্য।

স্বপ্না থেমে থেমে বললে, মনোতোষবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন, এ কথা ভাবতেই পারা যায় না। তার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গির ভিতরে ছিল জীবনের প্রবল উচ্ছাস। পৃথিবী ছিল তার কাছে পরম উপভোগ্য।

ডাক্তার বললেন, কিন্তু এখানে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো কিছুর কথা মনে ওঠে কি?

সকলেই মাথা নাড়লে। ঘরের ভিতরে বাইরের কোনো লোকই আসেনি, সকলেই স্বচক্ষে দেখেছে যে, মনোতোষ নিজেই গেলাসটা তুলে নিয়ে লেমোনেডটা পান করেছে। গেলাসের মধ্যে যদি সায়ানাইডের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তার জন্যে মনোতোষ ছাড়া আর কেউই দায়ী হতে পারে না।

কিন্তু—কিন্তু মনোতোষ আত্মহত্যা করবে কেন?

মহেন্দ্র বললে—চিন্তিতভাবেই বললে, ডাক্তার আপনার কথা কিন্তু আমার মনে ঠিক লাগছে না। আত্মহত্যা করার দিকে যে শ্রেণির লোকের ঝোঁক থাকে, মনোতোষবাবুকে দেখলে সে শ্রেণির লোক বলে মনে হয় না।

ডাক্তার বললেন, আমিও আপনার কথাই মানি। এ হচ্ছে অদ্ভুত রহস্য!

ডাক্তারের সঙ্গে অমলেন্দু মনোতোষের অসাড় দেহটাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে এল তার শয়নগৃহে।

তারা যখন ফিরে এল, প্রত্যেকেই তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। রাত্রি ঠান্ডা নয়, কিন্তু দেখলে মনে হয় প্রত্যেকেরই দেহ যেন শীতার্তের মতোই কম্পমান।

সৌদামিনী বললেন, রাত হল, এখন আমাদের ঘুমুতে যাওয়া উচিত। বড়ো ঘড়িটার দিকে সবাই তাকিয়ে দেখলে। বেজে গেছে রাত বারোটা। সৌদামিনীর কথায় সবাই মনে মনে সায় দিল বটে, কিন্তু কেউই যেন দল ছাড়া হতে প্রস্তুত নয়। তারা কেউ যেন শয়নগৃহে গিয়ে একলা হতে চায় না। কিন্তু চন্দ্রবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমাদের সকলেরই এখন খানিকটা ঘুমের দরকার।' বলে তিনি নিজেই অগ্রসর হলেন।

আর-সকলে তখন তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে লাগল।

নিঝুম রাত্রি। দূর থেকে সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহল ছাড়া আর কোনো শব্দই ভেসে আসছে না। প্রত্যেকের পায়ের চাপে কাঠের সিঁড়িটা যেন আর্তনাদ করে ভেঙে দিতে লাগল বাড়ির ভিতরকার স্তব্ধতা। কোণে কোণে দেখা যাচ্ছে কালো কালো ছায়া, দেখলেই ছাৎ ছাৎ করে ওঠে মন। কিন্তু এ হচ্ছে একেবারে আধুনিক বাড়ি—শক্তিশালী পেট্রোলের ল্যাম্পের আলোকপ্রবাহে সমুজ্জ্বল। কোথাও লুকোচুরির কোনো জায়গাই নেই। তবু একটা অপার্থিব ভাব মনকে দিতে চায় আচ্ছন্ন করে এবং এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ!

ভূতপূর্ব জজ নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করে আগে করলেন জামাকাপড় পরিবর্তন।

সোফার উপরে তিনি তার পাইপে তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন।

তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠল আসামি বরেন বসুর মূর্তি—যার ফাঁসি হয়েছিল তারই হুকুমে।

তাঁর স্পষ্ট মনে আছে বরেন বসুর চেহারা। দেখতে ছিল সে সুপুরুষ। আর তার সেই সপ্রতিভ, অকপট দুটি চোখ। অত্যন্ত সরলভাবে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে। সেই জন্যেই জুরিরা তার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি পুরাতন ব্যবহারজীবী— আগে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তারপর হয়েছিলেন জজ। জীবনে অসংখ্য অপরাধীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, সুন্দর সরল মুখ দেখে ভোলবার পাত্র নন তিনি।

তিনি দিয়েছিলেন তাকে প্রাণদণ্ড, আইনের দিক দিয়ে তা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয়নি।

মনে মনে তিনি মৃদুহাস্য করলেন। তারপর জলভরা গেলাসের ভিতরে নিজের বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে রেখে দিলেন। তার মুখের নীচের দিকটা চুপসে গেল। অতিশয় নিষ্ঠুর দেখাতে লাগল তার মুখের নীচের দিকটা। আবার হাসতে হাসতে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, বিরেনের প্রাণদণ্ড দিয়েছি, বেশ করেছি!' তারপর সোফা থেকে উঠে আলো নিবিয়ে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

নীচেকার হলঘরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল মহেন্দ্র। তাকে দেখাচ্ছিল হতভম্বের মতো ।

এক কোণে টেবিলের উপরে যেখানে তথাকথিত হারাধনের ছেলের মূর্তিগুলো ছিল, সেইদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে তার চোখ দুটা হয়ে উঠেছে বিস্ফারিত।

সে অস্ফুট স্বরে বললে, এ আবার কী কাণ্ড! আমি হলপ করে বলতে পারি, এখানে একটু আগে ছিল ঠিক দশটা পুতুল!

মেজর সেনের চোখে ঘুম নেই—বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলেন তিনি।

আলোকহীন অন্ধকার ঘর—কিন্তু সেই অন্ধকারেও তার চোখের সামনে জেগে উঠেছে সুরেন্দ্রনাথ পালের মূর্তি।

প্রথমটা তিনি সুরেনকে পছন্দ করতেন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এই পারিবারিক দুর্ঘটনার মূলে ছিল সুরেনেরই চক্রান্ত, তখন তার নাম মনে করলেও তার মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত দারুণ ক্রোধে।

তারপর উত্তর-আফ্রিকার সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। হ্যাঁ, সুরেন যে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না, সেটা ভালো করে জেনেই তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন শত্রুদের বিরুদ্ধে। কেন পাঠাবেন না? তার জঘন্য চক্রান্তের ফলেই ছারখার হয়ে গিয়েছে তার সংসার, বিষময় হয়ে উঠেছে তার জীবন। সে-রকম নিকৃষ্ট জীবকে পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে দিলে মানুষের উপকার করাই হয়।

সেই সময়ে ফৌজের কোনো কোনো লোক তাকে সন্দেহ করেছিল। কানাঘুষায় তিনি শুনলেন, সুরেনের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে তাকেই। কিন্তু সেখবর তো ফৌজের বাইরের আর কারুর জানবার কথা নয়। সুদীর্ঘ দশ বৎসর আগেকার কথা, আজ আবার নতুন করে ওঠে কেন?

বিনিদ্র স্বপ্নাও বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। ঘরের আলো জ্বলছে। অন্ধকারে থাকতে তার ভয় করে। সে ভাবছে : নীরেন্দ্রনারায়ণ, নীরেন্দ্রনারায়ণ! আজ রাত্রে কেন আমার মনে হচ্ছে, তুমি আবার আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছ? সাগর-সমাধি ছেড়ে কেন তুমি আবার উঠে এসেছ?

সেদিন চোখের সামনে দেখলুম, তলিয়ে গেলে তুমি অতল জলে! ভেবেছিলুম তোমার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত আর আমার মনকে পীড়া দিতে পারবে না।

আবার—তুমি কে? কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ? তুমিও কি তোমার হারা ছেলেকে খুঁজতে এসেছ এখানে?

লোকে কী বলে শুনেছিলে তো? আমার কাছে তুমি করেছিলে বিবাহের প্রস্তাব। আমিও রাজি হয়েছিলুম। তার অল্পদিন পরেই নীরেন্দ্রনারায়ণ জলে ডুবে মারা যায়। শুনেছি কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল যে, যাতে সে তোমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমি ইচ্ছা করেই সমুদ্রের কবল থেকে উদ্ধার করিনি তাকে ।

তুমিও কি এইসব কথা শুনেছিলে? শুনে কি বিশ্বাস করেছিলে? জানি না।

জনবার অবসরও আর পাইনি। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহও হয়নি। কারণ পুত্রশোকে তুমি যে শয্যা নিলে, সেই শয্যাই হল তোমার মৃত্যুশয্যা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাত। জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে খানিকটা সূর্যালোক।

ডাক্তার বোস বিছানার উপর উঠে বসেই শুনতে পেলেন, বাইরের থেকে সজোরে দরজা ঠেলতে ঠেলতে নিত্যাননন্দ ডাকছে, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন, ব্যাপার কী নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ কাঁপতে কাঁপতে বললে, ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রীর কী হয়েছে! আমি তাকে জাগাতে পারছি না। আমি তাকে কিছুতেই জাগাতে পারছি না।

শীঘ্রহস্তে একটা জামা পরে নিয়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে ডাক্তার তার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

বিছানায় শুয়ে আছে সত্যবালা । ডাক্তার তার মাথার উপরে হাত রাখলেন। অস্বাভাবিক কনকনে ঠান্ডা! মিনিটখানেক পরীক্ষার পর ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন।

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে?

—তাহলে কি ওর হার্টফেল করেছে?

—তোমার স্ত্রীর কি বুকের কোনো অসুখ ছিল?

—কই, আমি তো কখনো শুনিনি।

—কাল রাত্রে ঘুমোবার আগে তোমার স্ত্রী কী খেয়েছিল?

—কিছু না। আপনি যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তারপরে আর কিছুই খায়নি।

বৈঠকখানায় আসন গ্রহণ করে চন্দ্রবাবু ও মেজর সেন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অমলেন্দু, মহেন্দ্র ও স্বপ্না

সকলেই উঠে গিয়েছিল বাড়ির বাইরে। ফিরে এসে তারা তিন জনেও গিয়ে বসল, বৈঠকখানায়।

সৌদামিনী এতক্ষণ পরে উপরে থেকে নেমে এসে শুধোলেন, মোটরলাঞ্চখানা ফিরে এসেছে কি?

স্বপ্না বললে, না।

ডাক্তার ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, চা আর খাবার তৈরি করে নিত্যানন্দ এখনই আপনাদের ডাকবে। আজ তার কাজে কিছু গলদ হলে আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

সৌদামিনী বললেন, তার মানে?

—আগে আমাদের চা-টা খাওয়া হয়ে যাক, তারপর কারণ কী শুনবেন। কেউ আর কিছু বললে না। এমন সময়ে নিত্যানন্দ একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের চা প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে খাবার ঘরে চলুন। তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন।

চা-পানের পর সবাই আবার বৈঠকখানায় এসে আসন গ্রহণ করলে। ডাক্তার বললেন, এইবারে আপনাদের একটা কথা বলা দরকার। সত্যবালা কাল রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা পড়েছে।

সকলেই চমকে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। স্বপ্না আর্তকণ্ঠে বললে, কী ভয়ানক! আবার মৃত্যু? এক দিনে দুই জনের মৃত্যু?

চন্দ্রবাবু বললেন, অসাধারণ ব্যাপার বটে। সত্যবালার মৃত্যুর কারণ কী?

ডাক্তার বললেন, শবব্যবচ্ছেদ না করলে তা বলা সহজ নয়।

স্বপ্না বললে, সত্যবালাকে দেখেই আমি বুঝেছিলুম, তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। কালকেই সেই দুর্ঘটনার জন্যে হয়তো তার হার্টফেল করেছে।

ডাক্তার বললেন, তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু কী জন্য তা বন্ধ হয়েছে সেইটেই এখন বিবেচ্য।

সৌদামিনী বললেন, বিবেক!

ডাক্তার তার দিকে ফিরে বললেন, আপনার কথার অর্থ কী সৌদামিনী দেবী?

সৌদামিনী বললেন, আপনারা সবাই তো শুনেছেন! নিস্তরিণী দেবীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী সে আর তার স্বামী।

—আপনিও তাই মনে করেন নাকি?

—হ্যাঁ। আমি এই অভিযোগ সত্য বলেই মনে করি। অভিযোগের কথা শুনেই সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয় সামলাতে না পেরেই তার হার্ট ফেল করেছে। এ হচ্ছে ভগবানের বিচার।

চন্দ্রবাবু বললেন, ভগবান বিচার করেন মানুষের সাহায্যেই। কিন্তু এখানে এমন কে মানুষ থাকতে পারে?

মহেন্দ্র বললেন, ঘুমোবার আগে সত্যবালা কী খেয়েছে, আর কী পান করেছে?

ডাক্তার বললেন, কিছু না।

—কিছু না? এক পেয়ালা চা? এক গেলাস জল? নিশ্চয়ই সে কিছু না কিছু খেয়েছে?

নিত্যানন্দ বলে, ঘুমোবার আগে কাল সে কিছুই খায়নি বা পান করেনি।

কতকটা ব্যঙ্গের স্বরে মহেন্দ্র বললে, ওঃ নিত্যানন্দ! সে তো বলবেই এ কথা!

অমলেন্দু বললে, মহেন্দ্রবাবু, আপনি কি নিত্যানন্দকেই সন্দেহ করেন?

—কেন করব না? কাল আমরা সবাই শুনেছি সেই অভিযোগের কথা। হতে পারে তা অমূলক, হতে পারে তা পাগলের প্রলাপ! কিন্তু, হতেও পারে তা সত্য কথা। সত্যবালা স্ত্রীলোক, অভিযোগ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। নিত্যানন্দের মনে এই ভয় হওয়া স্বাভাবিক যে, শেষ পর্যন্ত সত্যবালা হয়তো সব

কথা ফাঁস করে দেবে। তারপর—বুঝতেই পারছেন তো? নিজের গলা বাঁচাবার জন্যে সে তার স্ত্রীর মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে।

এমন সময় ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

মেজর সেন বললেন, তোমার স্ত্রী মৃত্যুর কথা শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি!

নিত্যানন্দ কেবল নিজের কপালে হাত দিয়ে বললে, অদৃষ্ট!

আর সবাই চুপ করে রইল!

বাড়ির বাইরেকার চত্বরে দাঁড়িয়েছিল অমলেন্দু ও মহেন্দ্র।

অমলেন্দু বললে, এই মোটরলাঞ্চ— বলতে বলতে সে থেমে গেল।

মহেন্দ্র বললে, আপনি কী ভাবছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। আমারও মনে জেগেছে ওই প্রশ্ন। এতক্ষণে লাঞ্চখানার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা আসেনি। কেন?

অমলেন্দু বললে, ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর পেয়েছেন?

—আমার মতে লাঞ্চখানা না-আসা কোনো দৈব ঘটনা নয়।

—'অর্থাৎ আপনি বলতে চান, লাঞ্চখানা আর আসবে না?

পিছন থেকে অধীর কণ্ঠে শোন গেল—না, না। মোটরলাঞ্চ আর ফিরে আসবে না?

দুজনেই একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, মেজর সেন।

মহেন্দ্র বললে, মেজরসাহেব, আপনারও তাই বিশ্বাস?

মেজর সেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয়ই তা আসবে না। আমরা সেখানাকে চাই এই দ্বীপ থেকে প্রস্থান করবার জন্যে। কেমন? কিন্তু এই দ্বীপ থেকে আর কোনোদিনই আমরা চলে যেতে পারব না। যতক্ষণ বেঁচে আছি, এই

দ্বীপেই আমাদের থাকতে হবে।' বলতে বলতে তিনি হনহন করে এগিয়ে চললেন একদিকে। সেই দিকে সিধে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে সমুদ্রতীর।

তার এলোমেলো গতি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন অগ্রসর হচ্ছেন অর্ধজাগ্রত অবস্থায়।

মহেন্দ্র খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিতমুখে বললে, আর একজনেরও মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের সকলেরই অবস্থা হবে ওই রকম।

অমলেন্দু বললে, কিন্তু আপনার মাথা ঠিকই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

গোয়েন্দা বিভাগের ভূতপূর্ব কর্মচারী মহেন্দ্র আনন্দহীন হাস্য করে বললে, প্রচুর কাঠ-খড় না পুড়লে আমার মাথা খারাপ হবে না। আর আমার মনে হচ্ছে, আপনার সম্বন্ধেও যেন ওই-কথাই বলা যায়।

অমলেন্দু বললে, অন্তত এখনও পর্যন্ত আমি পাগল হইনি।

চত্বরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার বোস—তার পিছনে পিছনে নতমস্তকে চন্দ্রবাবু। মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর দিকে এগিয়ে ডাক্তার কী বলতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে দ্রুতপদে সেখানে এসে নিত্যানন্দ বললেন, আমার একটা কথা শুনবেন কি?

ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মুখ দেখেই তার দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। সে মুখ মড়ার মতো সাদা, থরথর করে কাপছে আর সর্বাঙ্গ! নিত্যানন্দ বললে, আপনারা দয়া করে একবার বৈঠকখানায় চলুন। আপনাদের একটা ব্যাপার দেখাতে চাই।

সকলে আবার বৈঠকখানায় গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার বললেন, নিত্যানন্দ, তুমি অত কাঁপছ কেন? হয়েছে কী?

নিত্যানন্দ ভয়ার্তস্বরে বললে, এই বাড়ির ভিতরে এমন সব ব্যাপার হচ্ছে, যার মানে আমি বুঝতে পারছি না!

—ব্যাপার? কী ব্যাপার?

—আপনারা হয়তো আমাকে পাগল বলে ভাববেন! কিন্তু এই ব্যাপারের কোনো অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না!

—আরে বাপু, আসল কথা কী, তাই বলো?

নিত্যানন্দ বললে, ওই টেবিলের মাঝখানে কালকে দশটা পুতুল দাঁড় করানো ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ঠিক দশটা!

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, দশটা পুতুলই ছিল বটে। কাল আমরাও তা গুনে দেখেছিলুম।

নিত্যানন্দ বললেন, তাহলে শুনুন। কাল রাত্রে আপনারা উপরে যাবার পর আমি যখন ঘরের জানলা-দরজা বন্ধু করছিলুম, টেবিলের উপরে তখন দেখছিলুম মোটে নয়টা পুতুল। কিন্তু আবার এখন কী দেখছি জানেন? যদি বিশ্বাস না করেন, নিজেরাই গুনে দেখুন।

—এখানে রয়েছে মাত্র আটটা পুতুল! মাত্র আটটা! এর কি কোনো মানে হয়? মাত্র আটটা?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সৌদামিনী বললেন, স্বপ্না, চলো আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

স্বপ্না আপত্তি করলে না। তারা দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্বীপের একদিকে অগ্রসর হল। খানিক পরেই তারা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

সৌদামিনী বললেন, মোটরলাঞ্চ এখনও আসেনি দেখছি।

স্বপ্না বললে, এলে আমি বাঁচতুম। আমি—আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

সৌদামিনী বললেন, আমরা সকলেই যে এখান থেকে চলে যেতে চাই, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, যে চিঠিখানা লিখে আমাকে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তার কোনো কোনো জায়গায় গলদ ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি।

স্বপ্না বললে, সকালে আপনি যা বলেছিলেন, সেটা কি আপনার মনের কথা?

—কোন কথা?

—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, সত্যবালার মৃত্যুর জন্য নিত্যানন্দই দায়ী?

—হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি। তোমার কী মত?

—আমার মতামত কিছুই নেই।

অভিযোগ শুনেই সত্যবালা কীভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। নিত্যানন্দের হাত থেকেও কফির ট্রে পড়ে গিয়েছিল, এটাও ভুলো না। ওরা যে অপরাধী, এ-কথা অনুমান করা যায় খুব সহজেই। নিস্তারিণী দেবীর সম্পত্তির লোভেই ওরা সেই অপরাধ করেছিল।

—কিন্তু আর-সকলের সম্বন্ধে আপনার মত কী?

—মানে?

—আর-সকলের বিরুদ্ধেও যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে নিত্যানন্দের বেলাতেই বা তা সত্য হবে কেন?

সৌদামিনী বললেন, ওঃ, তুমি যা বলতে চাও বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, প্রথমে অমলেন্দুবাবুর কথাই ধরো। সিংহলের গহন বনে একুশ জন লোকের মৃত্যুর জন্যে তিনিই যে দায়ী, অমলেন্দুবাবু তো নিজের মুখেই একথা স্বীকার করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো অভিযোগ হচ্ছে হাস্যকর। চন্দ্রবাবুর কথাই ধরো। আগে তিনি ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। প্রমাণ পেলে অপরাধীকে তিনি দণ্ড দিতে বাধ্য। তারপর মহেন্দ্রবাবু, তিনি ছিলেন ডিটেকটিভ। তিনি যদি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন, আর তার জন্যে কারুর প্রাণদণ্ড হয়, তবে তাকেও দোষী বলা চলে না। আমার নিজের সম্বন্ধেও আমি অনেকটা ওই রকম কথাই বলতে পারি।

স্বপ্না জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল সৌদামিনীর মুখের পানে।

সৌদামিনী বললেন, অমলা নামে একটি গরিবের মেয়ে আমার কাছে থাকত। আমি তাকে যথেষ্টই স্নেহ-যত্ন করতুম। হঠাৎ একদিন আমার বাক্স থেকে একশো টাকার একখানা নোট চুরি গেল। তারপর সেই নোট পাওয়া গেল অমলারই কাছে। সে কেঁদেকেটে আমার পায়ে ধরে বললে, আমার দাদার অত্যন্ত অসুখ হয়েছে, পয়সার অভাবে তার চিকিৎসা হচ্ছে না, সেইজন্যে দায়ে পড়ে আমি ওই নোটখানা নিয়েছিলুম। তারপর আমি রাগ করে তাকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই। মনের দুঃখে সে করে আত্মহত্যা। তুমিই বলো স্বপ্না, অমলার মৃত্যুর জন্যে কি আমি দায়ী?

স্বপ্না বললে, অমলার মৃত্যুর পরে আপনি কি অনুতপ্ত হননি?

সৌদামিনী কঠিন কণ্ঠে বললেন, অনুতপ্ত হব? কোনো অন্যায় করিনি, অনুতপ্ত হব কেন?

চত্বরের উপরে ইজিচেয়ারে বসে চন্দ্রবাবু চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। খানিক তফাতে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে নীরবে সিগারেটের ধূমপান করছিল অমলেন্দু ও মহেন্দ্র।

ডাক্তার বোস বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, অমলেন্দুবাবু, আপনার সঙ্গে আমি দু-চারটে কথা কইতে পারি কি?

—নিশ্চয়।

অমলেন্দুকে নিয়ে ডাক্তার বোস খানিক দূর অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, অমলেন্দুবাবু, আমি আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাই।

—কী বিষয় নিয়ে?

—আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। মহেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস, সত্যবালার মৃত্যুতে নিত্যানন্দের হাত আছে। আপনি কী বলেন?

অমলেন্দু একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কিছুই অসম্ভব নয়। তাদের জন্যেই যদি নিস্তারিণী দেবী মারা পড়ে থাকেন, তাহলে পাছে তার স্ত্রী ভয়ে সেই কথা প্রকাশ করে ফেলে, তাই ভেবেই নিত্যানন্দ হয়তো সত্যবালাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যবালার যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তার মৃত্যু হতে পারে দুটি কারণে। হয় নিত্যানন্দ বিষটিষ খাইয়ে তাকে মেরে ফেলেছে, নয় সত্যবালা নিজেই ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এক দিনেই এক বাড়িতেই দু-দুটো আত্মহত্যা কেমন যেন খাপ খায় না। তার একটু আগেই মনোতোষবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আর সেটাও নাকি আত্মহত্যা! কিন্তু—

—থামলেন কেন? কী বলছিলেন বলুন।

—কিন্তু আমার বিশ্বাস, মনোতোষবাবু আত্মহত্যা করেননি, কেউ তাকে হত্যা করেছে। সত্য করে বলুন দেখি, আপনিও কি মনে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেন না?

ডাক্তার বোস স্তব্ধ হয়ে রইলেন গম্ভীর মুখ। খানিকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আর ওই টেবিলের উপরে যে হারাধনের দশটি ছেলের মূর্তি রাখা হয়েছে, তারই বা রহস্য কী? প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালে একটা বাজে ছেলেভুলানো ছড়াই বা টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কেন? আজ নিত্যানন্দ আমাকে আরও কী দেখিয়েছে জানেন? টেবিলের উপর থেকে দুটো মূর্তিই কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে এখন আছে কেবল আটটা পুতুল।

অমলেনন্দু বিস্মিত স্বরে বললে, কিন্তু কাল আমি স্বচক্ষেই দেখেছি, টেবিলের উপরে দশটা পুতুল ছিল।

ডাক্তার গড়গড় করে বলে গেলেন

হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়
একটি কোথা হারিয়ে গেল
রইল বাকি নয়।
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল
রইল বাকি আট।

—রইল বাকি আট। আমাদের দলের দুজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, টেবিলের উপর থেকেও অদৃশ্য হয়েছে দুটো পুতুল। এ থেকে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছেন কি?

অমলেন্দু বললে, পাচ্ছি বই কি! ভয়াবহ ইঙ্গিত। কিন্তু মূর্তি দুটো সরালে কে?

— নিত্যানন্দ বলে, আমরা কয়জন ছাড়া এই দ্বীপে আর জনপ্রাণী নেই।

— নিত্যানন্দ ভুল বলেছে। কিংবা সে মিথ্যা কথা বলেছে!

—কিন্তু সে মিথ্যা বলেছে বলে আমার মনে হয় না। তার মুখ ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে।

অমলেন্দু বললে, দেখুন, মোটরলাঞ্চও আর ফিরল না। সবই সন্দেহজনক! বাতাস কোনদিকে বইছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে না কি? এখানে কীভাবে অতিথি সৎকার হবে, সেটাও ভাববার সময় এসেছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের মৃতদেহ সৎকারের লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ডাক্তার বোস বললেন, অথচ আমরা ছাড়া দ্বীপে আর কেউ নেই!

অমলেন্দু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, নিশ্চয়ই কেউ আছে! নইলে একে একে দুটো পুতুল সরিয়ে রাখলে কে? ছোটো দ্বীপ, এটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে বেশি বেগ পেতে হবে না।

—কিন্তু সত্যই যদি কারুকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে হবে বিপজ্জনক মারাত্মক শত্রু। আমাদের সে ক্ষমা করবে না।

অমলেন্দু বললে, কারুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে তার চেয়ে আমরাই হব বেশি মারাত্মক। মহেন্দ্রবাবুকেও আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। এরকম কাজের পক্ষে তিনি হচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তি। এসব কথা আর কারুর কাছে বলবার দরকার নেই, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দ্বীপটা খুঁজে দেখবার প্রস্তাব শুনে মহেন্দ্র সায় দিলে সানন্দে। বললে, পুতুল দুটো অদৃশ্য হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার। ধরলুম, নিত্যানন্দই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। কিন্তু মনোতোষবাবুর মৃত্যুকে আপনারা কি আত্মহত্যা বলে মনে করেন?

ডাক্তার বোস বললেন, না। আত্মহত্যা করবার জন্যে কেউ এই বিজন দ্বীপে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে না। মনোতোষবাবু ছিলেন জীবন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি, একেবারে আনন্দময় পুরুষ। তিনি যে পকেটে করে সায়ানাইড' বিষ নিয়ে এখানে এসেছিলেন, একথা কল্পনা করাও অসম্ভব।

মহেন্দ্র বললে, হ্যাঁ আমি সে-কথা মানি। মনোতোষবাবুর মতো মানুষ পকেটে বিষ নিয়ে আমোদ করে বেড়াতে আসতে পারে না। কিন্তু তার গেলাসে বিষ গেল কী করে?

অমলেন্দু বললে, সেটাও আমি ভেবে দেখেছি। মনোতোষবাবু খানিকটা লেমোনেড পান করে গেলাসটা টেবিলের উপরে রেখে আমাদের কাছে এসেছিলেন। টেবিলটা ছিল খোলা জানলার সামনে। সেই সময়ে বাইরের কোনো লোক নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে 'সায়ানাইড' ফেলে দিয়েছির গেলাসের ভিতরে। তারপর মনোতোষবাবু আবার গেলাসে চুমুক দিতে যান আর মারা পড়েন সঙ্গে সঙ্গেই।

অবিশ্বাসের স্বরে মহেন্দ্র বললে, জানলা দিয়ে কেউ গেলাসে বিষ ফেলে দিলে আর আমরা তাকে দেখতে পেলুম না?

অমলেন্দু বললে, আমরা সকলেই তখন দ্বীপের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট অন্যমনস্ক হয়ে ছিলুম।

ডাক্তার বললেন, সে কথা সত্য। আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শুনে আমরা তখন সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সে সময়ে আমাদের কারুরই দৃষ্টি ছিল না জানলার দিকে।

মহেন্দ্র বললে, আমার যা বিশ্বাস তাই বললুম। আচ্ছা, এইবারে আমাদের অন্বেষণা শুরু করা যাক। আমাদের কারুর কাছে অন্তত একটা রিভলভার" থাকলে ভালো হত। কিন্তু সে আশা করা বৃথা।

অমলেন্দু নিজের পকেটের উপরে হাত রেখে বললে, আমার কাছে একটা রিভলভার আছে।

দুই চক্ষু অত্যন্ত বিস্ফোরিত করে মহেন্দ্র বললে, আপনি সর্বদাই সঙ্গে রিভলভার রাখেন?

অমলেন্দু বললে, সাধারণত তাই রাখি বটে। জীবনে বারবার আমাকে বিপদ-আপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে। কাজেই এটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে।

মহেন্দ্র বললে, তাই নাকি? তা এখানকার মতো ভয়াবহ বিপদের মাঝখানে আমরা বোধহয় আর কখনো পড়িনি। যদি এই দ্বীপের কোথাও কোনো উন্মাদগ্রস্ত হত্যাকারী লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে দু-একটা রিভলভার কি ছোরাজুরি নয়, দস্তুরমতো একটা অস্ত্রশালার অধিকারী হতে পারে।

ডাক্তার বললেন, আপনার এ-অনুমান হয়তো ঠিক নয়। আমি দেখেছি এ শ্রেণির হত্যা-ব্যাধিগ্রস্ত পাগলকে চোখে দেখলে চেনা যায় না। মনে হয়, তারা বেশ নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু এই দ্বীপবাসী উন্মত্ত যে নিরীহ ব্যক্তি, আমার তা মনে হয় না।

তারা তিন জনে দ্বীপটা ভালো করে খুঁজে দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। ছোটো দ্বীপ। মাঝে মাঝে বনজঙ্গল থাকলেও তা খুব গভীর ও দুর্ভেদ্য নয়। চারিদিকটা ঘুরে আসতে গেলে খুব দীর্ঘকালের দরকার হবে না।

খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় তারা জলের ধারে এসে পড়ল। সেইখানে প্রায় সমুদ্রের মতো বিশাল নদীর মোহনার দিকে মুখ করে মূর্তির মতো বসে আছেন মেজর সেন। তার দৃষ্টি দিকচক্রবালরেখার দিকে বিস্তৃত। আগন্তুকদের পদশব্দেও তিনি একবারও ফিরে তাকালেন না। সেখানে তিনি ছাড়া যে আর কারও অস্তিত্ব আছে, এ সম্বন্ধেও যেন তার কোনো চেতনাও নেই!

মহেন্দ্র ভাবলে, এটা যেন কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। মেজর সেন কি সমাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন? গলা তুলে সে বললে, বাঃ আপনি তো বেশ শান্তিপূর্ণ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন!

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে মেজর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, আর সময় নেই, হাতে আর বেশি সময় নেই। এখন আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।

মৃদুকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। দ্বীপটা খুঁজে দেখছি, হয়তো ঝোপঝাড়ের ভিতরে কোন শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে।

মেজর সেন আবার ভুরু সঙ্কুচিত করে বললেন, আপনারা বুঝতে পারবেন না—আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। দয়া করে আমাকে একলা থাকতে দিন।

মহেন্দ্র তার কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে বললে, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে লাভ নেই।

অমলেন্দু কৌতুহলী হয়ে শুধোলে, উনি কী বললেন?

—ওঁর হাতে আর সময় নেই। আমরা যেন ওঁকে আর বিরক্ত না করি।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলেন, আশ্চর্য! এ আবার কী কথা?

সারা দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

তারা তিন জনে নদীর অতিদূরবর্তী অস্পষ্ট সীমারেখার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও একখানা নৌকা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বাতাস ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

অমলেন্দু বললে, বোধ হচ্ছে ঝড় উঠবে। নিকুচি করেছে, এখান থেকে ওপারের কোনো গ্রাম পর্যন্ত দেখা যায় না। অথচ তীরের কাছাকাছি খাজুরী আর নন্দীগ্রাম বলে দুটো পল্লি আছে। আমরা কি আগুন-টাগুন জেলে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না?

মহেন্দ্র বললে, শুকনো বনে আগুন লাগিয়ে দেখলে হয়।

অমলেন্দু বললে, কিন্তু আমার মনে হয় সে গুড়েও বালি। যে শয়তান এমন আটঘাট বেঁধে আমাদের এই দ্বীপে এনে ফেলেছে, সে কি ও কথাও ভেবে দেখেনি?

মহেন্দ্র বললে, আপনার কথার মানে?

—ঠিক মানে যে কী তাও বলা কঠিন। হয়তো গ্রামবাসীদের আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা হয়েছে, দ্বীপ থেকে আমরা কেউ নিশানা বা সংকেত করলেও তারা যেন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে না আনে।

—আর গ্রামবাসীরা সুবোধ বালকের মতো এই প্রস্তাবে সায় দেবে?

—হয়তো তাদের বলা হয়েছে, জনকয়েক লোককে ঠাট্টা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই দ্বীপের মধ্যে, একটা বাজি জেতবার জন্যে।

স্বপ্নার আর ভালো লাগছিল না সৌদামিনীকে। কী কঠিন স্ত্রীলোক। তার দ্বারা অপমানিত হয়ে এক অভাগি আত্মহত্যা করলে, তবু তিনি অনুতপ্ত নন? তার মনে দুঃখের লেশ নেই?

সৌদামিনী তার সামনে সিধে হয়ে বসে নির্বাক মুখে বুনে যাচ্ছিলেন পশমের কী একটা জিনিস। তার সান্নিধ্য স্বপ্নার আর সহ্য হল না। সে উঠে পড়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর লক্ষ্যহীনের মতো বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ল দ্বীপের কিনারায়। সেখানে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন মেজর সেন। স্বপ্না যখন তার কাছে দিয়ে দাঁড়াল, তিনি মুখ তুলে কী রকম একটা উদ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কেন সে জানে না, তার বুকটা ছাৎ করে উঠল।

মেজর বললেন, ও তুমি! তুমি এখানে এসেছ?

স্বপ্না তার পাশে গিয়ে বসে বললে, এখানে চুপ করে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে আপনার বুঝি ভালো লাগছে?

মাথা নেড়ে শান্তভাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। বেশ জায়গা। এখানে বসে অপেক্ষা করতে ভালো লাগে।

স্বপ্না একটু সচকিত ভাবে বললেন, অপেক্ষা? কার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছেন?

মেজর তেমনি শান্তভাবেই বললেন, আমি অপেক্ষা করছি শেষ পরিণামের জন্যে। একথা কি তুমি জানো না? আমরা সকলেই তো অপেক্ষা করছি শেষ পরিণামের জন্যে।

স্বপ্নার প্রাণটা ধড়ফড় করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বললে, আপনি কী বলতে চান?

মেজর সেন গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আমরা কেউ আর এই দ্বীপ থেকে ফিরে যাব না। শীঘ্রই আমাদের মুক্তির দিন আসছে।

স্বপ্না উঠে দাঁড়াল। সভয়ে বললে, আপনি কী বলতে চান, আমি বুঝতে পারছি না।

মেজর বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি বাছা, আমি বুঝতে পেরেছি।

স্বপ্না উদ্বিগ্ন বললে, না, না, আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

মেজর আবার জলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না। সেখানে যে আর কেউ হাজির আছে, একথাও তিনি যেন ভুলে গেলেন।

স্বপ্না আর সেখানে দাঁড়াল না, দ্রুতপদে বাড়ির দিকে আসতে আসতে শুনতে পেলে, মেজর সেন আপন মনেই শান্তকণ্ঠে বলছেন, মুক্তি মুক্তি! মুক্তির আর বিলম্ব নেই।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মহেন্দ্র দেখলে, দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ডাক্তার বোস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সমুদ্রের দিকে প্রসারিত তার দৃষ্টি। মহেন্দ্রের সাড়া পেয়েই চমক ভাঙল ডাক্তারের। তিনি বললেন, মহেন্দ্রবাবু, আমার মনে জেগেছে এক দুর্ভাবনা।

মহেন্দ্র বললে, দুর্ভাবনা নিয়ে আমরা সকলেই তো এখানে ব্যস্ত হয়ে আছি।

অধীরভাবে হাত নেড়ে ডাক্তার বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আমি সকলকার কথা বলছি না। আমি ভাবছি মেজর সেনের কথা?

—মেজর সেনের কথা?

অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, আমরা পড়েছি কোনো উন্মাদগ্রস্ত হত্যাকারীর পাল্লায়। মেজর সেনকে দেখলে আপনার কী মনে হয়?

সচমকে মহেন্দ্র বলল, আপনি কি তাকে উন্মাদগ্রস্ত বলে মনে করেন?

ডাক্তার দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললেন, হয়তো এ-রকম কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আমি ডাক্তার হলেও উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই। মেজরের সঙ্গে এদিক নিয়ে আমরা কোনো কথা হয়নি, সুতরাং আমি নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারি না।

সেই সময়ে দুজনেই দেখলেন, নীচেকার চত্বর পার হয়ে অমলেন্দু ডান দিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ভূতপূর্ব ডিটেকটিভ মহেন্দ্র বললে, ডাক্তারবাবু, আমার কী মনে হয় জানেন?

—কী?

—ওই লোকটি ভালো নয়।

—অমলেন্দুবাবু? কেন?

—কেন তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু অমলেন্দুবাবুকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না।

ডাক্তার বললেন, শুনেছি জীবনে উনি অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার কোনো কোনো দুঃসাহসিক কাজের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা চলে না। সে একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে কি সর্বদাই রিভলভার থাকে?'

ডাক্তার চমকিত হয়ে বিস্ফরিত চক্ষে বললেন, আমার সঙ্গে— কী আশ্চর্য নিশ্চয়ই নয়! আমি কেন রিভলভার সঙ্গে রাখব?

ডাক্তার বললেন, হয়তো এটা হচ্ছে কু-অভ্যাস। যাক ও কথা। সারা দ্বীপ খুঁজেও আপনারা যখন জনপ্রাণীকেও আবিষ্কার করতে পারলেন না, তখন আমার মনে হয়, হয়তো কেউ এই বাড়ির ভিতরেই লুকিয়ে আছে। মস্ত বাড়ি, ঘর। এখানটা তো এখনও খুঁজে দেখা হয়নি।

মহেন্দ্র বললে, বেশ, এইবারে বাড়িটাই খুঁজে দেখা যাক। হয় এখানে কারুকে খুঁজে পাব, নয়তো এই দ্বীপের ভিতরে বাইরের জনপ্রাণী নেই।

নবম পরিচ্ছেদ

সারা বাড়িখানা তারা পাতিপাতি করে খুঁজতে বাকি রাখলে না, কিন্তু কোথাও কোনো অচেনা মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুর-বিড়ালেরও সাড়া পাওয়া গেল না ।

অমলেন্দু ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, তাহলে আমাদেরই ধারণা ভ্রান্ত দেখছি। এখানে উপর উপরি দুটো আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা যতসব আজব কল্পনা আর কুসংস্কারের দুঃস্বপ্ন নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছি।

ডাক্তার বোস গম্ভীর স্বরে বললেন, কিন্তু আমাদের এই ভয় যুক্তিসঙ্গত। আমি হচ্ছি ডাক্তার, অনেক আত্মঘাতীকে আমি দেখেছি। মনোতোষবাবুর চেহারা আর প্রকৃতি আত্মঘাতীদের মতো ছিল না।

অমলেন্দু সন্দেহজড়িত কণ্ঠে বললে, সেটা দৈব-দুর্ঘটনাও তো হতে পারে।

মহেন্দ্র সে-কথা আমলে না এনে বলে উঠল, আরে রাখুন মশাই আপনার দৈব-দুর্ঘটনা! তাহলে সত্যবালার মৃত্যুও তো একটা দৈবদুর্ঘটনা হতে পারে?

অমলেন্দু বললে, কেমন করে, শুনি?

মহেন্দ্র কেমন যেন কিন্তু কিন্তু করতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে সে হঠাৎ বললে, ডাক্তার, সত্যবালাকে আপনি একটা ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছিলেন না?

ডাক্তার বোস তার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিপাত করে বললেন, হ্যাঁ, দিয়েছিলুম বটে।

—ওষুধটা কী?

—আমি তাকে এক মাত্রা Trional দিয়েছিলুম। অত্যন্ত নির্দোষ জিনিস।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যায়নি তো?

ডাক্তার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আপনি কী বলতে চান আমি বুঝতে পারছি না।

—আমি বলতে চাই যে, ভুল করে মাত্রা আপনি খানিকটা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। এমন ব্যাপারও তো মাঝে মাঝে হয়?

ডাক্তার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, আমি কিছুমাত্র ভুল করিনি। আপনার ইঙ্গিত হচ্ছে হাস্যকর। বলেই একটু থেমে তিনি আবার কণ্ঠস্বরকে রীতিমতো কর্কশ করে তুলে বললেন, আপনি কি বলতে চান যে সত্যবালাকে আমি ইচ্ছা করেই বেশি মাত্রায় ওষুধ দিয়েছি?

অমলেন্দু তাড়াতাড়ি বললে, দেখছি আপনারা দুজনেই উত্তেজিত হয়েছেন। এমন অশোভন বাদ-প্রতিবাদের দরকার কী?

মহেন্দ্র বললে, ডাক্তার বোস হঠাৎ ভুল করে ফেলেছেন, এইটুকুই আমি বলতে চাইছি।

ডাক্তার জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, বন্ধু, ডাক্তারদের এমন ভুল করলে চলে না।

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে মহেন্দ্র বললে, ওই গ্রামোফোন রেকর্ডের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, আগেও আপনি এইরকম ভুল করে ফেলেছেন।

ডাক্তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন। অমলেন্দু উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, মহেন্দ্রবাবু এ আপনি কী করছেন? আমরা সকলেই একই ফুটো-নৌকোর যাত্রী। ভুলে যাবেন না, গ্রামাফোন রেকর্ড জ্যোতির্ময় বসুর মৃত্যুর জন্য দ্বায়ী করেছে আপনাকেই।

মহেন্দ্র দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এক-পা এগিয়ে গেল। বিকৃত মুখে সে বললে, চুলোয় যাক, জ্যোতির্ময় বসু! রাবিশ, মিছে কথা! অমলেন্দুবাবু, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না, নিজের কথাটাও ভেবে দেখুন!

দুই ভুরু উপর দিকে তুলে অমলেন্দু বললে, আমার কথা!

—হ্যাঁ। আপনি হচ্ছেন এখানকার এক আমন্ত্রিত অতিথি। সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে কেউ কখনো সঙ্গে নিয়ে যায় রিভলভার? আমি এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

মহেন্দ্রের দিকে একটা অত্যন্ত বিতৃষ্ণা-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমলেন্দু বললে, তাই নাকি? এই প্রশ্নের উত্তর চান আপনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই!

অমলেন্দু অপ্রত্যাশিতভাবে বললে, দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আপনাকে যতটা বোকা দেখায় আপনি ততটা বোকা নন।

—হতে পারে। কিন্তু রিভলভার সম্বন্ধে আপনি কী বলতে চান?

এইবার অমলেন্দুর মুখে ফুটল হাসি, সে বললে, একটা বিপজ্জনক স্থানে আসতে হবে বলেই সঙ্গে আমি রিভলভার এনেছি।

অত্যন্ত সন্দিগ্ধস্বরে মহেন্দ্র বললে, আপনি এ কথা তো আগে আমাদের বলেননি?

—না।

—তাহলে আপনি আমাদের উপরে পাহারা দিতে এসেছেন?

—ধরুন তাই।

—আসল ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন দেখি?

অমলেন্দু আস্তে আস্তে বললে, বাইরে আমি সকলকে জানাতে চেয়েছি যে, আর-সকলের মতো আমিও এখানে এসেছি আমন্ত্রিত অতিথির মতো। সেটা ঠিক সত্য কথা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই: অ্যাটনি বিজন বোস ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। সে বললে, যথেষ্ট বিপদ-আপদেও আমি মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে পারি, আমার নাকি এই-রকম খ্যাতি আছে। অতএব আমি যদি এখানে এসে সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারি, তাহলে আমার লভ্য হবে পাঁচ হাজার টাকা। আমি ধনী নই, লোভে পড়ে রাজি হয়ে গেলুম।

কিন্তু অমলেন্দুর কথা মহেন্দ্রের মনে লাগল না। সে বললে, এসব কথা তো আপনি কালকেই আমাদের জানাতে পারতেন?

অমলেন্দু শেষটা নাচারের মতন বললে, প্রিয় মহেন্দ্রবাবু, এখানে যে কীরকম অভাবিত কাণ্ড-কারখানা হবে, কাল তা আমি জানব কেমন করে?

ডাক্তার বোস বললেন, তাহলে কালকের ব্যাপার দেখেশুনে আজ আপনার মত বদলে গেছে?

একটা কালো ছায়া এসে পড়ল অমলেন্দুর মুখের উপর। সে নীরস স্বরে থেমে থেমে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ জেনেছি আমরা সবাই হচ্ছি একই ফুটোনৌকোর যাত্রী। ওই পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে একটা বাজে টোপ, আর সেই টোপ গিলেছি আমি নির্বোধ মাছের মতো। আমরা ফাঁদে পা দিয়েছি মশাই, সকলেই একসঙ্গে একই ফাঁদে পা দিয়েছি। মনোতোষবাবুর মৃত্যু! সত্যবালার মৃত্যু! টেবিলের উপর থেকে দু-দুটো পুত্তলিকার অন্তর্ধান। এসবই হচ্ছে ভয়াবহ দুলক্ষণ! কিন্তু কে যে এই বিষম ফাদ পেতেছে তা আমরা কেউই জানি না, কারণ সেই শয়তান আমাদের সামনে এসে এখনও হয়নি মূর্তিমান!

দুপুরের আহারের জন্য ডাক এল। সকলে খাবার ঘরে গিয়ে দেখলে, টেবিলের উপরে সারি সারি সাজানো রয়েছে বিবিধ আহার্যের পাত্র।

একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল নিত্যানন্দ। তার স্থির মুখের পানে তাকালে তার মনের ভাব কিছুই ধরবার জো নেই।

অমলেন্দু বললে, লাঞ্চ-ও ফিরে আসেনি, দ্বীপেও হাট-বাজার নেই। লাঞ্চ যদি না আসে, আর এই দ্বীপে যদি আমাদের কিছুদিন বন্দি থাকতে হয়, তাহলে আমাদের খোরাক জুটবে কেমন করে নিত্যানন্দ?

আজ্ঞে, ভাঁড়ার ঘরে অনেক চাল, ডাল, আটা আর অন্যান্য জিনিস মজুত আছে। বিলিতি টিনের খাবারও এনে রাখা হয়েছে যথেষ্ট। বাহির থেকে খাবার না এলেও আমরা বেশ কিছুকাল চালিয়ে নিতে পারব।

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্র বললে, আকাশে মেঘ তো ক্রমেই পুরু হয়ে জমে উঠছে দেখছি। যদি দু-চার দিন ধরে দুর্যোগ চলে আর বাইরের কেউ এই দ্বীপের নাগাল না ধরতে পারে, তাহলে আমাদের অনাহার করতে হবে না শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

সৌদামিনী বললেন, আমরা তো সবাই হাজির আছি, কিন্তু মেজর সে কোথা?

স্বপ্না বললে, মেজর সেন সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। তাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখলুম! তার কথাও যেন খাপছাড়া বলে মনে হল।

ডাক্তার বোস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা ডান হাতের ব্যাপার শুরু করে দিন, আমি মেজর সেনকে ডেকে আনছি।

বাহির থেকে হঠাৎ একটা ঠান্ডা দমকা হাওয়া ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

স্বপ্না বললে, ঝড় উঠতে আর দেরি নেই বোধ হয়।

সকলে খাওয়ার কথা ভুলে উদ্বিগ্ন মুখে দৃষ্টিপাত করলে বাইরের দিকে। বাতাস ক্রমেই ঝোড়ো হয়ে উঠছে, সমুদ্রের কোলাহলও ক্রমেই হয়ে উঠছে উচ্চতর।

নিত্যানন্দ হঠাৎ সচমকে বললে, বাইরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। কে যেন ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে।

সকলেই শুনতে পেলে চত্বরের উপরে দ্রুত পদশব্দ। সকলেই একসঙ্গে উঠে পড়ে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন ডাক্তার বোস।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বলেন, মেজর সেন—

—মারা পড়েছেন! কথাগুলো ফস করে বেরিয়ে পড়ল মহেন্দ্রের মুখ থেকে।

সাত জন লোক তাকিয়ে দেখলে পরস্পরের মুখের দিকে।

মহেন্দ্র ও অমলেন্দু ধরাধরি করে মেজর সেনের দেহ নিয়ে যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে, ঠিক সেই সময়ে সারা দ্বীপের উপরে জেগে উঠল হু হু করে একটা দুর্দান্ত ঝড়ের দুরন্ত নিশ্বাস।

স্বপ্না খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় সেইখানে এসে হাজির নিত্যানন্দ।

সচকিত নেত্রে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে সে বললে, আমি এখানে দেখতে এসেছি—

কেন যে চিৎকার করলে তা সে জানে না, কিন্তু স্বপ্না সচিৎকারেই বলে উঠল, বুঝেছি নিত্যানন্দ, আমার মতো তুমিও কী দেখতে এসেছ! দ্যাখো, টেবিলের উপরে আছে এখন মোটে সাতটা পুতুল!

মেজর সেনের দেহ তাঁর শয়নকক্ষে স্থাপন করে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র ফিরে এসে দেখলে সকলেই এসে হাজির হয়েছে বৈঠকখানার ভিতরে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল বৃষ্টি। জানালার বন্ধ সার্শির উপরে দরদর করে ঝরে পড়ছে জল, সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে সৌদামিনী বসে আছেন নিষ্কম্প দীপশিখার মতো।

ডাক্তার বোস ঘরের ভিতরে পায়চারি করছেন। চন্দ্রবাবু কৌচের উপরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট, তার দুই চক্ষু অর্ধমুদ্রিত।

তারপর সোজা হয়ে বসে চোখ খুলে চন্দ্রবাবু বললেন, তারপর, ডাক্তার!

ডাক্তার পায়চারি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিবর্ণমুখে বললেন, এবারে আর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। মেজর সেনের মাথার পিছন দিকে কোনো কঠিন জিনিস দিয়ে কে প্রচণ্ড আঘাত করেছে!' ঘরের ভিতরে শোনা গেল কয়েকজনের অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

চন্দ্রবাবু শান্তভাবেই বললেন, যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, সেটা কি আপনি দেখেছেন?

—না।

—কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত?

—হ্যাঁ।

যখন চত্বরের পরে ইজিচেয়ারে বসেছিলুম, তখন একটা বিষয় লক্ষ করেছি। আপনারা কেউ কেউ আনাগোনা করছিলেন দ্বীপের এদিকে-ওদিকে। কারণটা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আপনারা দ্বীপটা খুঁজে দেখছিলেন, কোনো হত্যাকারী ওইখানে লুকিয়ে আছে কি না?

অমলেন্দু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, তাহলে আমার মতো আপনারাও বুঝতে পেরেছেন যে, মনোতোষবাবুর ও সত্যবালার মৃত্যু দৈব-দুর্ঘটনা কি আত্মহত্যা নয়। আর এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয় এটাও ধারণা করতে পেরেছেন যে, কোন উদ্দেশ্যে আমাদের সকলকে ভুলিয়ে এই দ্বীপে নিয়ে আসা হয়েছে।

মহেন্দ্র গর্জন করে বললে, আমরা কোনো পাগল খুনির পাল্লায় পড়েছি।

এখন তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। আপাতত আমাদের ভেবে দেখা উচিত, সবাই কী করে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারি।

ডাক্তার বোস কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু দ্বীপে বাইরের আর কেউ নেই! নিশ্চয়ই কেউ নেই!

এক হিসাবে আপনার মত ভ্রান্ত নয়। আমিও আজ সকলে ওই সিদ্ধান্তেই পৌছেছিলুম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই আমি আপনাদের বলতে পারতুম, এই দ্বীপের মধ্যে কোনো অজানা খুনিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সেই হত্যাকারী আছে এই দ্বীপের মধ্যেই। আইন যাদের স্পর্শ করতে পারে না, তার নিজের মনগড়া এমন কয়েকজন অপরাধীকেই দিতে চায় সে প্রাণদণ্ড। তার ফলে একে একে তিন জন লোক মারা পড়ল। অতএব আমাদের এই দণ্ডদাতা আছে এই দ্বীপের মধ্যেই—

—কিন্তু এই দ্বীপের ভিতরে কেমন করে সে লুকিয়ে আছে? খুব সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। সে হচ্ছে আমাদেরই একজন।

—না, না না না!

চিৎকার করে উঠল স্বপ্না—প্রায় ক্রন্দিত কণ্ঠেই।

কয়েকমুহূর্ত তার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, প্রিয় স্বপ্না দেবী, সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যকে অবহেলা করা চলে না। আমরা ভীষণ বিপদের মাঝখানে এসে পড়েছি। আমাদেরই মধ্যে একজন হচ্ছে হত্যাকারী। কিন্তু সে যে কে, তা আমরা জানি না। আমরা যে দশ জন লোক এই দ্বীপে এসেছি, তাদের ভিতর থেকে মৃত তিন জনকে এখন বলা চলে সন্দেহের অতীত। বাকি আছি আমরা সাত জন।

চন্দ্রবাবু একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার বললেন, আমি যা বললুম, আপনারা কি তা সত্য বলে মানতে রাজি আছেন?

ডাক্তার বোস বললেন, অদ্ভুত কথা! অথচ আপনার কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মহেন্দ্র বললে, হ্যাঁ, ওঁর কথাই ঠিক। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমার সন্দেহের কথা আমি বলতে পারি—

চন্দ্রবাবু হাত তুলে মহেন্দ্রকে স্তব্ধ হবার জন্যে ইঙ্গিত করে বললেন, আপনার সন্দেহের কথা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। আপাতত আমার মতে সকলে সায় দিচ্ছেন তো?

সৌদামিনী একটুও এপাশে-ওপাশে হেললেন না, ঠিক সিধে হয়ে বসেই বললেন, চন্দ্রবাবু, আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের এক জনের ঘাড়ে চেপেছে শয়তান।

স্বপ্না অস্ফুটকণ্ঠে বললে, আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না। না, এ হচ্ছে অসম্ভব!

চন্দ্রবাবু বললেন, আপনার কী মত অমলেন্দুবাবু?

—আমিও আপনার কথায় সায় দিচ্ছি।

চন্দ্রবাবুর মুখে ফুটল ক্ষীণ হাসির রেখা। তারপর তিনি বললেন, এখন প্রমাণগুলো পরীক্ষা করা যাক। আমাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে বিশেষ সন্দেহ করবার কারণ আছে কি? মহেন্দ্রবাবু, আমার মনে হয় এ-সম্বন্ধে আপনি যেন কিছু বলতে চান?

মহেন্দ্র জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, অমলেন্দুবাবু পকেটে রিভলভার নিয়ে এখানে এসেছেন। কাল এ-কথা তিনি কারুকে জানাননি। কিন্তু আজ স্বীকার করেছেন।

অমলেন্দু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, কাল কিছু না বলার কারণ ওঁদের জানিয়েছি, চন্দ্রবাবু। আপনিও কারণটা শুনুন। চন্দ্রবাবুর কাছে সব কথা সে আবার খুলে বললে।

মহেন্দ্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কোথায়?

চন্দ্রবাবু বললেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সকলেরই অবস্থা এক-রকম। একমাত্র প্রমাণ আমাদের মুখের কথাই। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি আবার বললেন, আমরা যে কী রকম অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছি, কেউ বোধহয়

সেটা এখনও ভালো করে বুঝতে পারছেন না। এখন কাজ করতে হবে মাত্র এক উপায়ে। আমাদের মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন, যাদের মনে করা যেতে পারে সকল সন্দেহের অতীত?

ডাক্তার বোস তাড়াতাড়ি বললেন, ডাক্তারি পেশায় আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আমার উপরে এমন সন্দেহ কেউই করতে পারবেন না যে—

চন্দ্রবাবু হাত তুলে তাকে স্তব্ধ হতে ইঙ্গিত করে বললেন, আমিও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু মশাই, তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। ডাক্তাররাও পাগল হয়ে যেতে পারে, বিচারকরাও পাগল হতে পারে। এই হিসাবে—' মহেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, পুলিশের পক্ষেও পাগল হওয়া অসম্ভব নয়।

অমলেন্দু বললে, আমাদের দলে দুই জন মহিলা আছেন, আশাকরি তাঁরা হচ্ছেন সকল সন্দেহের অতীত।

নীরস কণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, আপনি কি বলতে চান, মেয়েরা কোনোদিন খুন-খারাপ করেনি?

অমলেন্দু বিরক্তভাবে বললেন, নিশ্চয়ই তা মনে করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে এটা বোধহয় অসম্ভব যে—

চন্দ্রবাবু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, প্রিয় ডাক্তার, মেজর সেনের মাথায় আপনি যে ক্ষতচিহ্ন দেখেছেন, কোনো স্ত্রীলোক কি তাকে সে-ভাবে আঘাত করতে পারে?

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বললেন, নিশ্চয়ই পারে, অবশ্য উপযোগী অস্ত্র হতে পেলে।

চন্দ্রবাবু বললেন, এখানকার আর দুটো মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। পুরুষের মতো বিষ ব্যবহার করতে পারে যে-কোনো স্ত্রীলোকও।

স্বপ্না ক্রুদ্ধস্বরে বললে, চন্দ্রবাবু, আপনিও পাগলের মতো কথা বলছেন!

তার মুখের দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু ওজন-করা স্বরে বললেন, প্রিয় স্বপ্না দেবী, শান্ত হোন। আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ করছি না। আর সৌদামিনী দেবী, আমরা প্রত্যেকেই যে সন্দেহভাজন হতে পারি, আমার এ-কথায় আপনিও বোধহয় রাগ করেননি?

সৌদামিনী বসে বসে শুনছিলেন। মুখ না তুলেই স্থির কণ্ঠে তিনি বলেন, আমি যে তিন-তিন জন মানুষকে হত্যা করতে পারি, আমাকে যিনি চেনেন নিশ্চয়ই তিনি এমন অসম্ভব কথা ভাবতে পারবেন না। তবে এটাও ঠিক যে, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অপরিচিত, সুতরাং কেউ কারুকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। অতএব আমি আগে যা বলেছি এখনও তাই বলছি : আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে, যে হচ্ছে সত্যিকার শয়তান।

চন্দ্রবাবু বললেন, তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই। আমরা কেউই সন্দেহের অতীত নই।

অমলেন্দু বললে, কিন্তু নিত্যানন্দের সম্বন্ধে কী বলতে চান?

—তার মানে?

—আমার তো মনে হয় নিত্যানন্দের উপরে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না?

—কী হিসাবে শুনি?

—প্রথমত, এমন ভয়ানক কাজ করবার মতো বুদ্ধি তার আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, তার স্ত্রীও হয়েছে নিহত।

চন্দ্রবাবু দুই ভুরু কপালের উপরে তুলে বললেন, যুবক, আমার সামনে এমন কয়েকজন আসামিকে নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল স্ত্রীকে হত্যা করা। বিচারে তারাও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

—হতে পারে। পৃথিবীতে, পত্নীকে হত্যা করেছে এমন লোকের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সে যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। পাছে তার স্ত্রী সব

কথা ফাঁস করে দেয় সেই ভয়ে, অথবা স্ত্রী তার চোখের বালি হয়েছিল বলে নিত্যানন্দ তাকে হত্যা করতে পারে বটে। কিন্তু যে অপরাধ তারা দুজনে মিলেই করেছে, তারই জন্যে সে হত্যা করতে পারে না তার স্ত্রী সত্যবালাকে।

চন্দ্রবাবু বললেন, আপনি শোনা-কথাকে প্রমাণ বলে ধরে নিচ্ছেন। নিত্যানন্দ আর তার স্ত্রী দুজনে মিলে কারুকে যে হত্যা করেছে, এ কথা সত্য না হতেও পারে। হয়তো এটা হচ্ছে মিথ্যা অভিযোগ। সুতরাং—

—সুতরাং আপনার কথাই অভ্রান্ত বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। হত্যাকারী হচ্ছে আমাদেরই একজন। আমরা যে-কেউ হত্যাকারী হতে পারি।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন?

অমলেন্দু ও স্বপ্না জানলার ধারে বসেছিল একখানা কৌচের উপরে। জানলার শার্সি বন্ধ। বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝরছিল বৃষ্টিধারা। ঝোড়ো হাওয়া উন্মত্তের মতো গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ে জানলার শাসির উপরে মারছিল ধাক্কার পর ধাক্কা। দূরে দেখা যাচ্ছিল উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের উত্তেজিত নৃত্য।

অমলেন্দু বললে, সমস্তই হচ্ছে অসম্ভব কাণ্ড! মেজর সেনের শোচনীয় মৃত্যুর পর একটা বিষয়ে নেই কোনোই সন্দেহ। দৈব-ঘটনা বা আত্মহত্যা, এসব হচ্ছে বাজে কথা। খুন, খুন! এখানে তিন-তিনটে লোককে নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে।

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, ওঃ এ হচ্ছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!

অমলেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ। আমরা সকলেই বাস করছি দুঃস্বপ্নের রাজ্যে। এর পরে অত্যন্ত সাবধান হয়ে আমাদের এখানে থাকতে হবে।

স্বপ্না তার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বললে, ওদের মধ্যে হত্যাকারী কে, আপনি কি তা অনুমান করতে পারেন?

অমলেন্দুর ওষ্ঠাধরে ফুটল মৃদু হাস্য। সে বললে, ওদের মধ্যে? দেখছি ওদের দল থেকে আপনি আমাদের দুজনকেই বাদ দিতে চান। অবশ্য, সেটা মন্দ কথা নয়। নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি আমি নই হত্যাকারী। আর মানুষ খুন করবার মতো পাগলামি যে আপনার ভিতরেও আছে, একথাও আমি মনে করি না?

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে, আপনাকে ধন্যবাদ।

অমলেন্দু বললে, ঠিক ওই কারণেই আপনিও কি আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন না?

স্বপ্না একটু ইতস্তত করে বললে, আপনার মুখেই আমরা শুনেছি যে, সমস্যায় পড়লে আপনি একুশ জন মানুষের মৃত্যুর জন্যেও দায়ী হতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামোফোন রেকর্ডে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আপনাকে সেরকম লোক বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

অমলেন্দু বললে, যথার্থ কথা। ধরুন, এক জন কি দুই জন লোককে আমি হয়তো হত্যা করতে পারি। কিন্তু তারও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন আমি একটা কি দুটো নরহত্যা করব? নিশ্চয়ই কোনো লাভের লোভে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমার বা আপনার কোনোই লাভের আশা নেই। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, আপনি বা আমি এইসব খুনের জন্যে মোটেই দায়ী নই। তাহলে বাকি রইল আর পাঁচ জন মাত্র লোক। তাদের মধ্যে হত্যাকারী কে? আমি যদি চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করি, তাহলে আপনি কি অত্যন্তই অবাক হবেন?

স্বপ্না সবিস্ময়ে বলে উঠল, চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ! কেন?

—কেন, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে ভেবে দেখুন, তিনি হচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, আর বৎসরের পর বৎসর ধরে সর্বশক্তিমান বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করে আসছেন। নিজেকে মনে করেছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার একটিমাত্র ইঙ্গিতেই যে-কোনো মানুষ ত্যাগ করতে পারে অন্তিম নিশ্বাস। বিচারকের আসন ছেড়ে আজ তিনি নেমে এসেছেন বটে, কিন্তু নিজের শক্তির দম্ভ আজও ভুলতে পারেননি, কোনো মানুষকে আর প্রাণদণ্ড দেবার সুযোগ না পেয়েই হয়তো আজ তিনি পাগল হয়ে গেছেন!

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, হয়তো সেটা অসম্ভব নয়।

অমলেন্দু বললে, আপনি কাকে সন্দেহ করেন?

—ডাক্তার বোসকে।

—ডাক্তারকে কেন?

—প্রথম দুই মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় ডাক্তারদেরই। এটাও মনে রাখবেন, ডাক্তার বোস ঘুমোবার ওষুধ বলে সত্যবালাকে কী একটা পান করতে দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, সে কথা সত্য।

—তারপর ডাক্তার যখন মেজর সেনকে ডাকতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তার সঙ্গে কেউ ছিল না।

—হয়তো আপনার এ অনুমান যুক্তিহীন নয়।

ডাক্তার বোস অধীর কণ্ঠে বললেন, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে—যেমন করে হোক বেরিয়ে পড়তেই হবে।

চন্দ্রবাবু জানলার শার্সির ভিতর দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বৃষ্টিস্নাত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতমুখে বললেন, আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে এই জল-ঝড় সম্ভবত আরও চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে থামবে না। এমন দুর্যোগে কোনো নৌকেই এই দ্বীপের কাছে আসতে পারবে না।

ডাক্তার প্রায় আর্তস্বরে বললেন, আর ইতিমধ্যে আমাদের সকলকেই একে একে প্রাণ দিতে হবে?

চন্দ্রবাবু বললেন, প্রাণ যে দিতেই হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। যে কোনো বিপদকে এড়াবার জন্যে আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি।

ডাক্তার বললেন, কিন্তু মনে রাখবেন, এর মধ্যেই তিন জন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

—হ্যাঁ, আমি তা ভুলিনি। কিন্তু তারা কোনো বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমরা আগে থাকতেই সাবধান হয়ে আছি।

ডাক্তার অসহায়ভাবে বললেন, কিন্তু কী আমরা করতে পারি? আজই হোক আর কালই হোক— বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। তারপর আবার বললেন, এসব যে কোন পাষণ্ডের কীর্তি, সেকথা পর্যন্ত আমরা জানি না।

—জানি না নাকি?

—আপনি কি কারুকে সন্দেহ করেছেন?

—অবশ্য আমার হাতে আসল প্রমাণ বলে কিছুই নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে একটা সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছি। একজনের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে।

ডাক্তার হতভম্বের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কার কথা বলছেন?

কিন্তু চন্দ্রবাবু কোনো জবাব দেবার আগেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র। এবং তারা আসন গ্রহণ করবার পরেই ঘরের ভিতরে হস্তদন্তের মতো এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

সে বাঁধো বাঁধো গলায় বললে, আপনারা কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন, স্নানঘরের দরজার পর্দাখানা কোথায় গেল?

অমলেন্দু বললে, স্নানঘরের দরজার পর্দা? তুমি কী বলতে চাও?

—পর্দাখানা আর খুঁজে পাচ্ছি না।

চন্দ্রবাবু বললেন, আজ সকালে সেখানা কি যথাস্থানেই ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহেন্দ্র বললেন, কী রকম পর্দা?

—স্নানঘরের দেওয়াল আর মেজের রং লাল। তার সঙ্গে মিলিয়ে দরজায় ঝোলানো ছিল একখানা লাল রঙের পর্দা।

অমলেন্দু বললে, ‘পর্দাখানা তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না?

—আজ্ঞে না?

মহেন্দ্র শুকনো হাসি হেসে বললে, পর্দাখানা তাহলে আপনা আপনিই অদৃশ্য হয়েছে? কথাটা পাগলের মতন শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু এ হচ্ছে পাগলেরই বাড়ি। পর্দাখানা নেই বলে কোনো দরকার নেই আর মাথা ঘামাবার। তার কথা ভুলে যাও। একখানা লাল রঙের পর্দা দিয়ে কেউ কারুকে খুন করতে পারে না।

আর কিছু না বলে নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতরে বসে প্রত্যেকেই তাকাতে লাগল প্রত্যেকের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

রাত্রে সবাই মৌনমুখে আহার করতে বসল। বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে মেঘের আর ঝড়ের গজন। ঘরের ভিতরে জ্বলছে বটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলো, কিন্তু তবু চারিদিকে যেন ঘনিয়ে আছে একটা থমথমে ভয় ভয় ভাব!

অমলেন্দু হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, উপরে তিনটে ঘরে রয়েছে তিনটে মৃতদেহ সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হল না।

চন্দ্রবাবু বললেন, এই দুর্যোগে সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হতে পারে না। উপরন্তু যতক্ষণ আমরা বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করতে পারি ততক্ষণই ওই দেহগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আগে পুলিশে খবর দিতে হবে তারপর অন্য কথা?

সৌদামিনীর সঙ্গে স্বপ্নাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললে, রাত বাড়ছে, আমরা এখন ঘুমোতে যাই।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু ঘুমানোর আগে কেউ যেন ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলবেন না।

চন্দ্রবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদেরও ঘুমোবার সময় হয়েছে। চলুন সবাই, আশা করি কাল সকালেই সুপ্রভাত' বলে পরস্পরকে সম্বোধন করতে পারব।

সকলের শেষে গাত্রোত্থান করে মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। একবার ঘরের চারিদিকে বুলিয়ে নিলে তার অতি সতর্ক দৃষ্টি। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বললে, আজ আর কেউ বোধ হয় হারাধনের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাতকাল। জলঝড়ের মাত্রা খানিক কমে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও সূর্যহীন আকাশ হয়ে আছে মেঘে মেঘময়।

বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে মহেন্দ্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে বেলা তখন সাড়ে সাতটা।

বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হল। সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর গলায় শোনা গেল, মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু, এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি?

মহেন্দ্র ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললে, ব্যাপার কী, এত ডাকাডাকি কেন?

অমলেন্দু বললে, নিত্যানন্দ রোজ সকালে সাড়ে ছ-টার সময় আমাদের চা প্রস্তুত করে। কিন্তু আজ এখনও তার কোনো সাড়া বা পাত্তাই নেই। তার ঘরে গিয়েছিলুম, সেখানেও দেখতে পেলুম না তাকে।

ইতিমধ্যে আর-সকলেও নিজের নিজের ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

চন্দ্রবাবু বললেন, নিত্যানন্দ রান্নাঘরে গিয়ে বোধ হয় আমাদের প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যস্ত আছে। চলুন, দেখে আসি।

সকলে নীচে নেমে এসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে টেবিলের উপরে চায়ের কেটলি, পেয়ালা ও খাবারের প্লেটগুলো সাজানো রয়েছে বটে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদৃশ্য! এমনকি উনুনে আগুন পর্যন্ত জ্বলছে না। তারপর সকলে প্রবেশ করলে বৈঠকখানার মধ্যে। সে-ঘরও শূন্য।

আচম্বিতে স্বপ্নার মুখে ফুটল অস্ফুট এক আর্তস্বর! বিহ্বলের মতো সে চন্দ্রবাবুর একখানা হাত সজোরে চেপে বলে উঠল, দেখুন, দেখুন! টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখুন!

টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে আর-একটা হারাধনের ছেলে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র ছয়টা পুতুল।

অল্পক্ষণ পরেই নিত্যানন্দের সন্ধান পাওয়া গেল। উঠানে নেমে উনুনে আগুন জ্বালাবার জন্যে সে জ্বালানি কাঠ কাটতে গিয়েছিল। সেইখানেই তার দেহটা মাটির উপরে পড়ে রয়েছে, হাতের মুঠোর ভিতরে তখনও সে চেপে ধরে আছে একখানা কাটারি!

তার কণ্ঠের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত এবং একটু তফাতে পড়ে রয়েছে একখানা রক্তাক্ত ভোজালি!

ডাক্তার বললেন, গলার পিছন দিকে আঘাতের চিহ্ন। নিত্যানন্দ যখন হেট হয়ে কাঠ কাটছিল, ঠিক সেই সময় নিশ্চয়ই কেউ এসে তাকে আক্রমণ করেছে।

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এভাবে অস্ত্রাঘাত করবার সময় কি খুব বেশি শক্তির দরকার হয়?

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আপনি যা বলতে চান, বুঝেছি। হ্যাঁ, এ কাজ কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারাও হতে পারে।' বলেই তিনি পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। সৌদামিনী ও স্বপ্না সেখানে নেই। তারা তখন গিয়েছিল রান্নাঘরের ভিতরে।

ভোজালির হাতলটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মহেন্দ্র বললে, উহু, আঙুলের দাগ নেই। হাতলটা যেন ভালো করে মুছে ফেলা হয়েছে।

হঠাৎ শোনা গেল খিলখিল করে হাসির শব্দ; সবাই ফিরে দাঁড়াল সচকিতে। উঠানের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। খিলখিল করে হাসতে হাসতে থেমে থেমে সে বললে, হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! বলতে পারো হারাধনের ছেলেগুলো যায় কোথায়? হা হা হা!

স্বপ্না কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছে? সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

স্বপ্না বলে উঠল অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে 'অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে না। তোমরা কি ভাবছ আমি পাগল? আমি ঠিক কথাই বলছি। হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! ও, তোমরা কি সেই ছেলে-ভুলানো ছড়াটা শোনোনি?—

'হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি মল দুখান হয়ে—'

হা হা হা! সে উদ্রান্তের মতো হাসতেই লাগল। ডাক্তার বললেন, হিস্টিরিয়া, এ যে স্পষ্ট হিস্টিরিয়ার লক্ষণ! সবুর করুন।

তিনি স্বপ্নার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার গণ্ডদেশে করলেন সজোরে এক চপেটাঘাত। সে চমকে উঠল, দু-এক বার হেঁচকি তুললে এবং ঢোক গিললে।

আপনাকে ধন্যবাদ। এইবারে আমি সামলে নিয়েছি।

তারপর সে আবার রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, সৌদামিনী দেবী আর আমি চা-টা তৈরি করব। আমাদের দয়া করে উনুনে আগুন দেবার জন্যে কিছু কাঠ এনে দিন।

মহেন্দ্র বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনার চিকিৎসা ফলপ্রদ হয়েছে।

ডাক্তার কাচুমাচু মুখে বললেন, বাধ্য হয়েই আমাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হল। এত বিপদের ভিতরে আবার হিস্টিরিয়া নিয়ে জড়িয়ে পড়া চলে না?

অমলেন্দু বললে, স্বপ্না দেবীকে দেখলে তো মনে হয় না ওঁর হিস্টিরিয়া আছে।

ডাক্তার বললেন, না, না, স্বপ্না দেবী হচ্ছেন বুদ্ধিমতী আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু এই আচমকা বিপদের ধাক্কা উনি সামলাতে পারেননি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সকলের চা-পান ও জলখাবার খাওয়া হয়ে গেল।

এইবারে এইঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসা যাক।

সকলেই তার কথায় সায় দিলে। স্বপ্না বললে, আমি তাড়াতাড়ি প্লেটগুলো সাফ করে নিয়েই যাচ্ছি।

সৌদামিনী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েই আবার ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, উঃ মাগো!

চন্দ্রবাবু চমকে শুধোলেন, ব্যাপার কী সৌদামিনী দেবী?

সৌদামিনী বললেন, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। ডাক্তার বোস তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, মাথা ঘুরছে? খুবই স্বাভাবিক! এখানে বিপদের উপরে বিপদ। দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দিচ্ছি।

—না! সৌদামিনী এমন চিৎকার করে শব্দটা বলে উঠলেন যে, সকলেই সবিস্ময়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। তার মুখের উপরে সন্দেহের স্পষ্ট চিহ্ন।

ডাক্তার আহত কণ্ঠে বললেন, বেশ, আপনার যা অভিরুচি।

সৌদামিনী বললেন, আমি কিছুই খাব না—আমি কিছুই খেতে চাই না। কিছুক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকলেই আমার মাথা ঘোরা আপনিই সেরে যাবে।

আর-সকলেই বৈঠকখানায় বসে সৌদামিনীর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মহেন্দ্র বললেন, আমি সৌদামিনী দেবীকে সন্দেহ করি।

ডাক্তার বললেন,কেন?

—উনি আমাদের কাছে থেকেও কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে থাকেন।

স্বপ্না বললে, আমরা দুজনে যখন চা তৈরি করছিলুম, তখন সৌদামিনী দেবীর কথাগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছিল।

অমলেন্দু বললে, তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। আপাতত আমাদের সকলেরই মাথা অল্প-বিস্তর খারাপ হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, প্রায় পনেরো মিনিট সময় কেটে গেল। এইবারে সৌদামিনী দেবীকে ডেকে আনা দরকার।

স্বপ্না উঠে পাশে খাবার ঘরে ঢুকেই তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। সকলে সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলে, সৌদামিনী চেয়ারের উপরে বসে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর ওষ্ঠাধর নীলাভ এবং তার বিস্ফারিত দুই চক্ষে নেই জীবন্ত দৃষ্টি।

মহেন্দ্র সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, এ কী ব্যাপার? সৌদামিনী দেবী যে বেঁচে নেই!

চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন, আমাদের ভিতর থেকে আর-একজনও সকল সন্দেহ থেকে মুক্তিলাভ করলেন–কিন্তু অত্যন্ত অসময়ে।

ডাক্তার মৃতদেহের উপরে হেট হয়ে তার ওষ্ঠাধরের আঘ্রাণ নিলেন এবং দুই চোখের পাতা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অমলেন্দু বললে, মৃত্যুর কারণ কী ডাক্তার? আমরা তো একটু আগেই সৌদামিনী দেবীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখে গিয়েছিলুম।

মৃতদেহের কণ্ঠের দক্ষিণ দিকে একটি চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে ডাক্তার বললেন, ওটা হচ্ছে হাইপোড়ামিক সিরিঞ্জের চিহ্ন।

চন্দ্রবাবু বললেন, কোনো বিষের জন্যে কি ওঁর মৃত্যু হয়েছে?

ডাক্তার বললে, মনে তো হচ্ছে সায়ানাইড। খুব সম্ভব পোটাসিয়াম সায়ানাইড। সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে।

অমলেন্দু চিৎকার করে বললে, এ কোনো উন্মাদগ্রস্তের কীর্তি। পাগল হয়ে গিয়েছি আমরা সকলেই!

চন্দ্রবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, না, আমরা এখনও বিবেচনা করবার শক্তি হারাইনি। এই বাড়িতে কেউ কি সঙ্গে করে 'হাইপোডামিক সিরিঞ্জ' এনেছে?

ডাক্তার যেন কিছু বিচলিত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, আমি এনেছি।'

চারজোড়া চক্ষু আকৃষ্ট হল ডাক্তারের দিকে। চারজোড়া বিজাতীয় সন্দেহপূর্ণ চক্ষু!

ডাক্তার বোস বললেন, ডাক্তারদের সঙ্গে সর্বদাই থাকে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ।

চন্দ্রবাবু বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু ডাক্তার, সেটা এখন কোথায় আছে বলতে পারেন কি?

—আমার ঘরে সুটকেসের ভিতরে।

চন্দ্রবাবু বললেন, চলুন—সেটা এখন সেখানে আছে কি না দেখে আসা যাক ।

পাঁচ জন একসঙ্গে নীরবে দোতলায় গিয়ে উঠল।

ডাক্তারের সুটকেসের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হল।

হাইপোডামিক সিরিঞ্জ পাওয়া গেল না।

ডাক্তার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, জিনিসটা কেউ তাহলে চুরি করেছে।

আবার চারজোড়া চক্ষু দারুণ সন্দেহে বিষাক্ত হয়ে উঠল!

চন্দ্রবাবু বললেন, এ-ঘরে আছি আমরা পাঁচ জন। এই পাঁচ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই এক জন হচ্ছে হত্যাকারী! ডাক্তার আপনার সঙ্গে আছে কী ওষুধ?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, আপনারা নিজেরাই অনায়াসে খুঁজে দেখতে পারেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, অমলেন্দুবাবু, আপনার কাছে আছে একটা রিভলভার?

অমলেন্দু তপ্তস্বরে বললে, হ্যাঁ আছে, তাতে হয়েছে কী?

—বর্তমান অবস্থায় আমাদের কারুর কাছেই কোনো বিপজ্জনক জিনিস থাকা উচিত নয়। ওই রিভলভারটা এখন আমাদের জিন্মায় জমা রাখলেই ভালো হয়। আমরা ওটা কোনো নিরাপদ জায়গায় রেখে দেব।

অমলেন্দু বেগে মাথা নেড়ে বললে, মোটেই নয়! রিভলভারটা কিছুতেই আমি কাছছাড়া করব না।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে চন্দ্রবাবু বললেন, অমলেন্দুবাবু, আমাদের এই ভূতপূর্ব ডিটেকটিভ মহেন্দ্রবাবুকে দেখলে মনে হয়ে, উনি আপনার চেয়ে বলবান ব্যক্তি। তার উপরে ওঁর সঙ্গে আছি আমরা আরও তিন জন। বুঝতেই পারছেন, আপনি এখন আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলেও বিফল হবেন।

দাঁত-মুখ খিচিয়ে অমলেন্দু বললে, বেশ, এ-কথার উপরে আমার আর কিছু বলবার নেই।

চন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, এইবারে আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বলছেন। রিভলভারটা কোথায় আছে?

—আমার ঘরে একটা টেবিলের দেরাজের ভিতরে।

—উত্তম!

—আমি সেটা এখুনি এনে দিচ্ছি।

—আপনি একলা কেন, আমরা সকলেই একসঙ্গে আপনার ঘরে যাব।

ভ্রুকুটি করে অমলেন্দু বললে, আপনি হচ্ছেন এক বিষম সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। কারুর কথাতেই বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু অমলেন্দুর ঘরে গিয়ে দেখা গেল তার টেবিলের দেরাজের ভিতর রিভলভার নেই।

অমলেন্দু বললে, তারপর?

চন্দ্রবাবু বললেন, এখন আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, অমলেন্দুবাবুর রিভলভারটা গেল কোথায়?

মহেন্দ্র বললে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র রিভলভারের মালিকই?

অমলেন্দু উগ্রকণ্ঠে বললেন, নির্বোধ! রিভলভার কোথায় গেছে আমি তার কী জানি? নিশ্চয়ই কেউ সেটা চুরি করেছে।

চন্দ্রবাবু শুধোলেন, রিভলভারটা শেষ কখন আপনি দেরাজের ভিতরে দেখেছেন?

—কাল রাত্রে, শোবার আগে।

—তাহলে নিশ্চয়ই সেটা চুরি গিয়েছে আজ সকালে। হয়তো যখন আমরা নিত্যানন্দের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিলুম। সেই সময়েই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—আমাদের মধ্যে একজন, আমাদের মধ্যে একজন, আমাদের মধ্যে একজন? প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কের মধ্যে এই তিনটি শব্দই বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

পাঁচ জন লোক—পাঁচ জন আতঙ্কগ্রস্ত লোক! পাঁচ জনের প্রত্যেকেই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে লক্ষ করছে পরস্পরের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি। তাদের মনের বিষম সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের মুখে-চোখে, তা গোপন করার চেষ্টাও কেউ করছে না।

পাঁচ জন লোক—প্রত্যেকেই পরস্পরের শত্রু! কেবল কোনো রকমে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েও তারা পরস্পরের সঙ্গে বাস করছে এক জায়গায়।

সেদিন রান্নাবান্নার কথা কারুরই মনে জাগল না। ভাড়ার ঘরে কয়েকরকম বিস্কুটের টিন এবং এয়ার টাইট' টিনের পাত্রে বিলাতি ফল ও দেশি রসগোল্লা ছিল। তাই খেয়েই সকলে নির্বাপিত করলে জঠরাগ্নি।

ডাক্তার বোস বললেন, এই ভয়াবহ বাড়ির ভিতরে এমন করে বন্দি হয়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু বাইরে যাবারও কোনো উপায় নেই। তাকিয়ে দেখুন।

হ্যাঁ, বাইরে আবার নেমেছে ঝরঝরে বৃষ্টি-ধারা এবং আবার প্রবল হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ঝোড়ো-হাওয়া! উচ্চতর হয়ে আবার ভেসে আসছে সমুদ্রের উচ্ছসিত কোলাহল।

ডাক্তার বললেন, চলুন আমরা দোতলার হলঘরে বসিগে যাই। নীচেটা আর আমার ভালো লাগছে না। সত্যবালা ছাড়া আর সকলেরই মৃত্যু হয়েছে একতলাতেই।

মহেন্দ্র, অমলেন্দু ও স্বপ্নাও এই প্রস্তাবে সায় দিলে। তারা একসঙ্গে উপরে উঠে গেল।

দোতলার হলঘর থেকে আরও ভালো করে দেখা যেতে লাগল দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সারা আকাশ ভরে জমে উঠেছে মেঘের পর মেঘের অশ্রান্ত মিছিল। মাঝে মাঝে লক লক করে জুলে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নিসপ। ধারাপাত-ধ্বনিতে চারিদিক পরিপূর্ণ। অরণ্যের বড়ো বড়ো গাছগুলো আর্তনাদ করে হেলে হেলে পড়ছে উন্মত্ত ঝড়ের ধাক্কার পর ধাক্কায়। সমুদ্রকে দেখাচ্ছে এক ক্রুদ্ধ ও অনন্ত জলদানবের মতো, উদাম বেগে উৎকট স্বরে চিৎকার করতে করতে অগণ্য তরঙ্গবাহু তুলে রংবার সে দ্বীপের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ফিরে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ফিরে যাচ্ছে।

কারুর মুখেই একটি কথা নেই। কিন্তু ওই বিশাল সমুদ্রের মতোই যে তাদের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছিল, এটা বোঝা যায় তাদের বিভ্রান্ত মুখের উপরে দৃষ্টিপাত করলেই।

স্বপ্নার দেহের ভিতরটা কেমন শীত শীত করতে লাগল, একটা কোনো গরম গাত্রবস্ত্র আনবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, চন্দ্রবাবু কোথায়? তিনি তো এখানে নেই! আমি ভেবেছিলুম তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উপরে এসেছেন।

ডাক্তার বললেন, না, তিনি বৈঠকখানাতেই বসে আছেন।

প্রত্যেকেই আবার প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে ত্রস্ত দৃষ্টিতে।

অমলেন্দু বললেন, এই বিপজ্জনক বাড়িতে তিনি বুড়োমানুষ একলা বসে আছেন!

মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভালো কথা নয়, এ ভালো কথা নয়! চলুন, আমরা সকলে গিয়ে তাকে উপরে ডেকে আনি।

সকলে একসঙ্গে আবার নেমে গেল একতলায়। সর্বাগ্রে যাচ্ছিলেন ডাক্তার বোস। বৈঠকখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন! বাকি তিন জনে তার দেহের এপাশ-ওপাশ থেকে দৃষ্টিপাত করলে বৈঠকখানার ভিতর দিকে।

দেখা গেল, একখানা সোফার উপরে চন্দ্রবাবু চুপ করে বসে আছেন। কিন্তু তার গায়ে জড়ানো আছে একখানা টকটকে লাল রঙের গাত্রাবরন এবং তার মাথায় আছে পরচুলা–হাইকোর্টের বিচার-কক্ষে জজের যে-রকম পরচুলা মাথায় পরে থাকেন।

এই একান্ত অভাবিত ও অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে সকলেরই বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে উঠল।

ডাক্তার বোস মাতালের মতন টলতে টলতে অগ্রসর হয়ে চন্দ্রবাবুর সেই স্থির মূর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। একবার তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করেই তিনি শীঘ্র হস্তে তাঁর পরচুলা ধরে একটা টানা মারলেন। পরচুলাটা ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল; দেখা গেল, চন্দ্রবাবুর মাথার সামনেকার কেশহীন অংশটা। ঠিক সেইখানেই রয়েছে একটা রক্তাক্ত ছিদ্র!

মহেন্দ্র বলে উঠল, রিভলভার! সেই রিভলভারটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

জীবনহীন স্বরে ডাক্তার বোস বললেন, রিভলভার দিয়ে কেউ গুলি ছুড়েছে— চন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই।

স্বপ্না হেট হয়ে পড়ে মাটির উপর থেকে পরচুলাটা তুলে নিলে। তারপর সভয়ে বলে উঠল, এ যে দেখছি পশমে তৈরি! কালকেই সৌদামিনী দেবী বলেছিলেন, তার এক বান্ডিল পশম তিনি আর খুঁজে পাচ্ছেন না!

মহেন্দ্র বললে, চন্দ্রবাবু ওই লাল রঙের গায়ের কাপড়! ওটা হচ্ছে সেই স্নানঘরের হারিয়ে যাওয়া পর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বপ্না ভয়ার্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, এই বীভৎস দৃশ্য দেখাবার জন্যেই কি হত্যাকারী ওই পর্দা আর পশমের বান্ডিল চুরি করেছে?

আচম্বিতে অমলেন্দু হা হা করে অট্টহাস্য করে বলে উঠল, এইখানেই হল কঠোর নির্দয় বিচারপতি চন্দ্রকান্ত চৌধুরির জীবন-নাট্যের বিয়োগান্ত সমাপ্তি। বিচারগুহে বসে জজের পরচুলা মাথায় পরে তিনি আর কারুর উপরেই প্রাণদণ্ড দিতে পারবেন না, কারণ আজই তিনি কোনো অজ্ঞাত হত্যাকারীর আদেশে নিজেই লাভ করেছেন প্রাণদণ্ড!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তারা চন্দ্রবাবুর দেহকে তুলে নিয়ে তার ঘরের ভিতরে গিয়ে রেখে এল।

বৈঠকখানায় ফিরে এসে মহেন্দ্র সোজা গিয়ে দাঁড়াল সেই টেবিলের সামনে, যার উপরে আগে ছিল দশটা হারাধনের ছেলের মূর্তি, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র চার।

মহেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বললে, আমরা হচ্ছি গুনতিতে চার জন মানুষ, আর আমাদের সামনেও রয়েছে চারটে পুতুল। চার জন মানুষ আর চারটে পুতুল। একটা করে মানুষ মরবে আর একটা করে পুতুল অদৃশ্য হবে। কিন্তু শেষ পুতুলটা নিশ্চয়ই অদৃশ্য হবে না। আমাদের মধ্যে যে হত্যাকারী, শেষ পুতুলটা ভেঙে ফেলে নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করবে না। অতএব—

ডাক্তার বললেন, অতএব?

মহেন্দ্র বললে, অতএব শেষ পুতুলটা নয় জন লোকের মৃত্যুর পরও ওই টেবিলের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তখন যে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, সে ব্যক্তির নাম কী?

সবাই সচমকে দৃষ্টিপাত করলে পরস্পরের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল না কেবল বিভীষিকার ভাব, ছিল বিষম এক বিরাগভরা সন্দেহ।

আমরা সকলেই তখন এই বাড়িতেই উপস্থিত ছিলুম। কিন্তু আমরা কেউ শুনতে পাইনি রিভলভারের শব্দ। এর কারণ কী?

অমলেন্দু বললে, এর কারণ হচ্ছে ঝড়ের আর সমুদ্রের গর্জন। মাঝে মাঝে বাজও ডাকছিল। এত গোলমালের ভিতরে ডুবে গিয়েছিল সেই রিভলভারের শব্দ ।

সে রাত্রে তারা সকাল সকালই শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হল। মহেন্দ্র বললে, আজ রাত্রে নিশ্চয়ই আমাদের কারুরই ঘুম হবে না। জেগে থাকবে

হত্যাকারী, আর একটা শিকারের সন্ধানে। আর জেগে থাকবে বাকি তিন জনও দারুণ আতঙ্কে। হত্যাকারী এখন সশস্ত্র, রিভলভার' এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং সশব্দে দরজা করলে অগলবদ্ধ! চার জন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ, প্রত্যেকেই যে-কোনোরকমে আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত।

অমলেন্দু ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নাতে নিজের মুখ দেখে মনে মনেই বললে—অমলেন্দু, তোমার মুখের ভাব অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সাবধান, শেষটা তুমিও যেন পাগল হয়ে যেয়ো না।

হঠাৎ অকারণেই টেবিলের একটা দেরাজ টেনে তার ভিতরে সে করলে দৃষ্টিনিক্ষেপ।

দেরাজের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে তার রিভলভারটা। সে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত ভাবে।

প্রাক্তন গোয়েন্দা মহেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বসল বিছানার একপাশে। তার চক্ষের ভাব হিংস্র, কোনো শিকারি জন্তুর মতো সে যেন যে-কোনো শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। বিছানায় শয়ন করবার জন্যে তার একটুও ইচ্ছা হল না। বিপদ এখন খুব কাছেই ঘনিয়ে এসেছে—দশ জনের মধ্যে বাকি আছে মাত্র চার জন। অতি শীঘ্রই নিশ্চয় আর-একজনকেও বিদায় নিতে হবে। কিন্তু এবারে যে তার পালা নয়, সে বিষয়ে তার কোনোই সন্দেহ নেই।

হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বাইরে তার দরজার সামনেই জাগল কার পদশব্দ। পা টিপে টিপে কেউ চলছে বটে, কিন্তু মহেন্দ্রর সতর্ক কর্ণকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কারুর পদশব্দ। সিঁড়ির উপর দিয়ে শব্দটা নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। মহেন্দ্র হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেলে বাঘের মতো লাফিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও কারুকেই দেখতে পেলে না, একটা ছায়া পর্যন্ত না। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল স্বপ্নার ঘরের দিকে। দরজার উপরে সজোরে করাঘাত করতেই ভিতর থেকে স্বপ্না সভয়ে বলে উঠল, কে, কে, কে?

স্বপ্না তাহলে বাইরে বেরিয়ে আসেনি! তারপর সে গেল ডাক্তারের ঘরের দিকে। সে ঘরে দরজা ছিল ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভিতরে কেউ নেই। ডাক্তারের শয্যা শূন্য।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে, ডাক্তার বোস, ডাক্তার বোস!

মহেন্দ্র দৌড়ে গেল অমলেন্দুর ঘরের দিকে। দরজায় করাঘাত করতেই ভিতর থেকে অমলেন্দু দিলে সাড়া।

মহেন্দ্র চিৎকার করে ডাকলে, অমলেন্দুবাবু, অমলেন্দুবাবু! শীঘ্র বাইরে বেরিয়ে আসুন।

মিনিটখানেক পরেই খুলে গেল ঘরের দরজা। অত্যন্ত সন্তপর্ণে বাইরে বেরিয়ে এল অমলেন্দু। তার ডান হাতটা আছে পকেটের ভিতরে। সে উগ্রকণ্ঠে বললে, রাত দুপুরে এ-সব কী কাণ্ড? ততক্ষণে স্বপ্নাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। মহেন্দ্র বললে, আমি বাইরে শুনতে পেয়েছি কার পায়ের শব্দ। বেরিয়ে এসে দেখি ডাক্তারের ঘরের দরজা খোলা আর ডাক্তার নেই ঘরের ভিতরে!

অমলেন্দু বললে, বটে, বটে, তাই নাকি? এই নিশুতি রাতে, এই ভয়াবহ বাড়িতে ডাক্তার নেই তার ঘরে? তাহলে সেই কি যত নষ্টের গোড়া?

মহেন্দ্র বললে, এখন আমাদের ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

অমলেন্দু বললে, স্বপ্না দেবী, আপনি আবার নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন। এরপর আমরা দুজনেই যদি একসঙ্গে এসে আপনাকে

ডাকি, তবেই আপনি দরজা খুলে দেবেন। আর কেউ ডাকলে দরজা খুলবেন না। বুঝেছেন?

স্বপ্না বললে, বুঝেছি! আমি নারী বটে, কিন্তু নির্বোধ নই। সে আবার চলে গেল তার ঘরের দিকে।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু ডাক্তারকে খুঁজতে হবে অত্যন্ত সাবধানে। ভুলে যাবেন না, তার হাতে আছে একটা গুলিভরা রিভলভার।

নীরস হাস্য করে অমলেন্দু বললে, ভুল মহেন্দ্রবাবু, ভুল! রিভলভারটা এখন আছে আমার পকেটেই! এই দেখুন! সে পকেটের ভিতর থেকে বার করে দেখালে রিভলভারের অর্ধেকটা।

মহেন্দ্রর মুখ রক্তহীন হয়ে গেল এক মুহূর্তে, সে আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

অমলেন্দু হা হা করে হেসে উঠে বললেন, মহেন্দ্রবাবু, নির্বোধের মতন ব্যবহার করবেন না। আমি যদি গুলি করে আপনাকে মারতে চাইতুম তাহলে রিভলভারের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করতুম না। এখন চলুন, ডাক্তার কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে দেখা যাক।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে অভাবিতভাবে। দমকা হাওয়া এখনও থেকে থেকে কেঁদে উঠছে বটে, কিন্তু নির্মেঘ আকাশে দেখা দিয়েছে চাদের জ্যোতির্ময় মুখ। চারিদিকে জ্যোৎস্নার দুগ্ধধবল স্বচ্ছ প্রলেপ। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ঝলকে ঝলকে উঠছে লক্ষ লক্ষ হীরার কণা।

কিন্তু মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর সমস্ত অন্বেষণই ব্যর্থ হল। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ডাক্তারকে ।

প্রায় শেষ রাত্রি। ঘুম নেই স্বপ্নার চোখে। বিছানার উপরে চুপ করে সে বসে আছে অত্যন্ত ছন্নছাড়ার মতো।

হঠাৎ ঘরের দরজায় হল দুমদুম করে করাঘাত। স্বপ্না চমকে বলে উঠল, কে, কে?

একসঙ্গে মহেন্দ্র ও অমলেন্দুর কণ্ঠে শোনা গেল, আমরা, দরজা খুলে দিন। দরজা খুলে দিতেই তারা দুজনে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

অমলেন্দু বললে, স্বপ্না দেবী, কোনো নতুন খবর আছে?

—না, কিন্তু আপনাদের খবর কী?

—ডাক্তার অদৃশ্য হয়েছে।

স্বপ্না চিৎকার করে বলে উঠল, কী?

—ডাক্তার এই দ্বীপের ভিতরে কোথাও নেই।

স্বপ্না অবিশ্বাসের স্বরে বললে, হতেই পারে না। নিশ্চয় সে কোথাও লুকিয়ে আছে! কখন হঠাৎ এসে আমাদের কারুকে আক্রমণ করবে।

মহেন্দ্র বললে, ঝড় নেই, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। আমরা ঈগলপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে সারা দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। তবু ডাক্তারের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না। সে অদৃশ্য হয়েছে—হাওয়া হয়ে যেন মিশিয়ে গিয়েছে হাওয়ার ভিতরে!

বৈঠকখানার টেবিলের উপরে দাড়িয়ে আছে এখন মাত্র তিনটে মাটির পুতুল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিনের সকালবেলা। প্রায় রাত চারটের সময় স্বপ্নার চোখে এসেছিল ঘুম, আজ সকালবেলা আটটার আগে সে আর বিছানা থেকে উঠতে পারলে না।

কিন্তু বিছানা থেকে নামতে না নামতেই ঘরের বাহির থেকে শুনতে পেলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্রর কণ্ঠস্বর। তারা তার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে।

দরজা খুলে দিতেই অমলেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, সমুদ্র আবার ডাক্তারকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কথার অর্থ ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল স্বপ্না। মহেন্দ্র বললে, বুঝতে পারছেন না? ডাক্তারকে সমুদ্র গ্রাস করেছিল কাল রাত্রে। আজ আবার ডাঙার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে তার মৃতদেহকে। আমরা দুজনে খুব ভোরবেলা উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলুম, ডাক্তারের দেহ দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এসেছি।

স্বপ্না শিউরে উঠে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে, কোথায়, কোথায় সে দেহ?

এসেছি। আপনার আর সে দৃশ্য দেখে কাজ নেই।'

স্বপ্না অমলেন্দু বললে, আমরা ডাক্তারের দেহটাকে তাঁর ঘরের ভিতরেই রেখে এসেছি। আমনার আর সে দৃশ্য দেখে কাজ নেই

স্বপ্না খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "আচ্ছা, আপনারা এখন নীচে যান। আমি জামাকাপড় বদলে এখনই গিয়ে চা আর খাবার তৈরি করে দিচ্ছি। যতই বিপদ হোক, আমরা তো উপোস করে থাকতে পারব না!

অমলেন্দু বললে, স্বপ্না দেবী, আপনি জামাকাপড় বদলে নিশ্চিন্ত হয়ে নীচে আসুন। ততক্ষণে আমরা নিজেরাই উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের কেটলি চড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকব।

সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে মহেন্দ্র বললে, অমলেন্দুবাবু, আপনার রিভলভারটা যদি সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিতে পারেন, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হই।

—কেন বলুন দেখি?

—ওই রিভলভারটা যতক্ষণ আপনার কাছে থাকবে, আমি নিজেকে নিরাপদ বলে ভাবতে পারব না।

অমলেন্দু বললে, প্রাণ থাকতে এ রিভলভারটা আমি কাছছাড়া করতে পারব না। এইসব বাজে কথা না ভেবে আপনি এখন কতকগুলো কাঠ কেটে আনুন দেখি! আমি রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের তোড়জোড় শুরু করে দিই।

তার পরের ঘটনা ঘটল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। অমলেন্দু টেবিলের উপরে প্লেটগুলো সাজাতে সাজাতেই স্বপ্না এসে তার সঙ্গে যোগদান করলে।

অমলেন্দু বললে, সবই প্রস্তুত, মহেন্দ্রবাবু এখন কাঠ নিয়ে এলেই হয়।

তার মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠানের দিক থেকে শোনা গেল একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ ও কোনো গুরুভার জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ।

স্বপ্না সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, ও কার আর্তনাদ অমলেন্দুবাবু, ও কীসের শব্দ?

অমলেন্দু বেগে বেরিয়ে গেল রান্নাঘরের ভিতর থেকে। স্বপ্না আড়ষ্ট হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল একখানা চেয়ারের উপর।

উঠানের দিকে থেকে শোনা গেল অমলেন্দুর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর—স্বপ্না দেবী, স্বপ্না দেবী! শীঘ্র এদিকে আসুন!

স্বপ্নার দেহ তখন অবশ হয়ে এসেছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে উঠানের দিকে গেল দ্রুতপদে। তারপর সেখানে গিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে

দেখলে, অমলেন্দু হাটু গেড়ে মাটির উপরে বসে আছে এবং তার সামনেই পড়ে রয়েছে মহেন্দ্রের রক্তাক্ত ও নিশ্চেষ্ট দেহ।

ভয়ে সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না একটা শব্দও।

অমলেন্দু বললে, মহেন্দ্রবাবুর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওই পাথরের ভাঙা আবক্ষ মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা ছিল দোতলার বসবার ঘরে! দোতলা থেকে কেউ ওটা মহেন্দ্রবাবুর মাথার উপরে ছুড়ে মেরেছে।

স্বপ্না থেমে থেমে বললে, কিন্তু দোতলায় তো জনপ্রাণী নেই!

দুজনে মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার ভিতরে—অমলেন্দু ও স্বপ্না।

সর্বপ্রথমে কথা কইলে অমলেন্দু। টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে আস্তে আস্তে বললে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর দুটো পুতুল। ও-দুটো হচ্ছে আমাদের দুজনেরই প্রতীক। এখন কার পালা আগে আসবে—আমার, না আপনার?

স্বপ্না সচিৎকারে বললে, এ বাড়ি অভিশপ্ত অমলেন্দুবাবু! এখানে দাঁড়িয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আসুন, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!

অমলেন্দু বললে, তাই চলুন। কিন্তু বাইরে গিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাব না—এ দ্বীপটাই হচ্ছে অভিশপ্ত!

দুজনে বাড়ির বাইরে গিয়ে দ্রুতপদে অগ্রসর হতে লাগল সমুদ্রের দিকে। যেতে যেতে এসে পড়ল একটা জঙ্গলের কাছে। সেখানে দাড়িয়ে রয়েছে তিনটে বড়ো বড়ো গাছ।

স্বপ্না হঠাৎ চলা বন্ধ করলে সেই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, অমলেন্দুবাবু, এক কাজ করতে পারেন?

—কী কাজ স্বপ্না দেবী?

—এই গাছটা খুব উঁচু, এর উপরে আপনি উঠতে পারেন?

অমলেন্দু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, কেন?

—এর উপরে উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। হয়তো জলের উপরে কোনো নৌকা কি ওপারের কোনো গায়ের চিহ্ন আপনার নজরে পড়তে পারে। দেখাই যাক না, যদি আমরা বাইরের কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

অমলেন্দু একটু ভেবে বললে, আপনার এ প্রস্তাব মন্দ নয়। আচ্ছা, আপনি নীচে দাঁড়ান, আমি গাছের উপরে উঠে দেখি কোথাও কিছু দেখতে পাওয়া যায় কি না?

অমলেন্দু পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেললে। তারপর দু-হাতে গাছের গুড়ি জড়িয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল। এবং উঠতে উঠতে অনুভব করলে, তার পকেটের ভিতরে ফস করে হাত চালিয়ে রিভলভারটা কে টেনে কারে নিলে।

—স্বপ্না দেবী, স্বপ্না দেবী!

স্বপ্না খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, এইবারে আমি নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারব!

অমলেন্দু লাফিয়ে পড়ল ভূমিতলের উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, স্বপ্না দেবী, এরকম কৌতুক আমি পছন্দ করি না। আমার রিভলভার এখনই ফিরিয়ে দিন।

স্বপ্ন দৃঢ়কণ্ঠে বললে, এ রিভলভার এখন আমার কাছেই থাকবে। আমি আপনাকে হত্যা করব না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

অমলেন্দু তার দিকে এগিয়ে গেল, স্বপ্নাও গেল পিছিয়ে। বললে, কিছুতেই এ রিভলভার আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। আপনি আরও এগিয়ে এলে নিজেই বিপদে পড়বেন।

অমলেন্দুর মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধে। আত্মহারার মতন গর্জন করে সে বললে, স্বপ্না ফিরিয়ে দাও আমার রিভলভার!

—কখনো না, কখনো না। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। নারী হলেই কেউ অবলা হয় না। চরম বিপদের সময় ভেড়াও ফিরে রুখে দাঁড়ায়। আপনি আর এক পা এগুলেই আমি রিভলভার ছুড়তে বাধ্য হব।

অমলেন্দু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তার মুখ-চোখ উদ্ভ্রান্তের মতো। ডান হাতে রিভলভার তুলে স্বপ্নাও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখে-চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

আচম্বিতে অমলেন্দু বন্য জীবের মতো সামনের দিকে লম্ফত্যাগ করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল স্বপ্নার হাতের রিভলভার।

তীব্র এক আর্তনাদ করে অমলেন্দু মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। দু-এক বার ছটফট করেই তার দেহ হয়ে গেল একেবারে নিস্পন্দ।

স্বপ্না হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল, তারপর দ্রুতপদে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে।

চত্বর পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে গেল দোতলায়, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো ভয় নেই! দ্বীপে এখন আমি একলা! হ্যাঁ, নয়টা মৃতদেহের মাঝখানে একলা বেঁচে আছি খালি আমি! আমার হাতে আছে রিভলভার—এখন আমি আর কারুকেই ভয় করি না! সাক্ষাৎ মৃত্যুও যদি আমার সামনে আসে, তাকে দেখেও আমি রিভলভার ছুড়তে ইতস্তত করব না! হা হা হা হা, আমি একলা—আমি একলা?

আচমকা পিছনে শোনা গেল যেন কার পদশব্দ। স্বপ্না ফিরে দেখবারও অবসর পেলে না, হঠাৎ সবলে কে চেপে ধরলে তার কণ্ঠদেশ!

তার হাত থেকে রিভলভারটা খসে মেঝের উপরে পড়ে গেল সশব্দে এবং ক্রমে ক্রমে তার চোখের সামনে পৃথিবী হয়ে এল অন্ধকার!

অবশেষ

'জলপরি' জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ভাসমান এক বোতলের ভিতরে এই বিবরণী পেয়ে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

'অ্যাডভেঞ্চারের' গল্পে প্রায়ই পাঠ করা যায়, একটা বোতলে কেউ কেউ দরকারি চিঠিপত্র ভরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, এবং অবশেষে সে বোতলটা হয়েছে অন্য কারুর হস্তগত। তারপর জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অদ্ভুত কোনো রহস্যের কাহিনি।

এই পদ্ধতিটা বরাবরই আকৃষ্ট করেছে আমাকে। আমিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করলুম। যখন এই ভাসমান বোতলটা জল থেকে কেউ উদ্ধার করবে, আমি তখন নিশ্চয়ই ইহলোকে বিদ্যমান থাকব না।

এক বিষয়ে আমি নিশ্চিত আছি। হারাধনের দ্বীপে দশ-দশটা হত্যাকাহিনি নিয়ে নিশ্চয়ই চারিদিকে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। এবং পুলিশও যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু তদন্তের যে কোনোই ফল হবে না এবং আসল হত্যাকারীকে কেউ যে আবিষ্কার করতে পারবে না, সেটাও আমি আগে থাকতেই অনুমান করতে পারছি। নিখুঁত অপরাধ করবার জন্যে উচ্চশ্রেণির অপরাধীরা প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। হারাধনের দ্বীপের হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সেইরকম এক নিখুঁত অপরাধ; পুলিশের সাধ্য নেই যে, এই মামলার রহস্য ভেদ করে। পুলিশের এই অসহায় অবস্থা কল্পনা করেই অতঃপর আমি নিজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চাই।

আমি হচ্ছি চন্দ্রকান্ত চৌধুরি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক। অত্যন্ত কঠোর বিচারক বলে আমার একটা কুখ্যাতি ছিল। সকলে আমার নাম দিয়েছিল, ফাসুড়ে জজ! সেটা নিতান্ত অমূলক নয়। অপরাধীদের চরম দণ্ড দেবার সুযোগ

পেলে, আমি একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করতুম। জীবনে বহু আসামিকেই প্রাণদণ্ড দিয়েছি, ক্ষমা করিনি কারুকেই।

অপরাধীর পর অপরাধীর বিচার করতে করতে আমার মনের ভিতরে আসে এক বিশেষ পরিবর্তন। দিনে দিনে ভালো করেই অনুভব করতে পারলুম যে, আমার চরিত্রও বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অন্য লোকে খুন করে ধরা পড়েছে এবং আমিও করেছি তার শাস্তিবিধান। ক্রমে ব্যাপারটা এমনি একঘেঁয়ে হয়ে উঠল যে, সেটাতে আমার মনে জাগত না আর কোনো উত্তেজনা।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম, হত্যাকারীর বিচারক না হয়ে আমি নিজেই যদি হই হত্যাকারী? সাধারণ নয়, অসাধারণ হত্যাকারী—যে হত্যা করবে, অথচ ধরা পড়ে আসামি হয়ে বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না। কেউ তাকে কোনোই সন্দেহ করতে পারবে না। অর্থাৎ সেই হত্যা হবে নিখুঁত অপরাধ।

বিচারকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর থেকে মনে মনে প্রায় নিখুঁত অপরাধের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতুম।

এই সময়ে পেলুম পরলোকের আমন্ত্রণ। আমি হৃদরোগের দ্বারা আক্রান্ত হলুম। তার উপরে আমার হল সন্ন্যাস রোগও রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়ায় দুইদুই বার অজ্ঞান হয়ে গেলুম। বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা মত প্রকাশ করলে, তৃতীয় আক্রমণই হবে আমার পক্ষে মারাত্মক। অর্থাৎ হয় হৃদরোগে, নয় সন্ন্যাসরোগে অদূর-ভবিষ্যতেই আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তখনই মনে মনে সংকল্প করলুম, আমার উচ্চাকাঙক্ষাকে সফল না করে পৃথিবী থেকে আমি বিদায় গ্রহণ করব না। নিখুঁত অপরাধ! হ্যাঁ, আমাকে করতে হবে একটা চিরস্মরণীয় অপরাধের অনুষ্ঠান!

লোকে যেমন বেছে বেছে বলির পশু সংগ্রহ করে, আমিও তেমনি বেছে বেছে এমন কয়েক ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করলুম, আইন যাদের দণ্ড দিতে পারেনি,

কিন্তু অপরাধী বলে যাদের কুখ্যাতি আছে। তাদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে আমাকে চর নিযুক্ত করে বড়ো অল্প অর্থ ব্যয় করতে হয়নি।

অ্যাটনি বিজন বোসকে মধ্যস্থ রেখে আমি কাজ শুরু করে দিলুম। যদিও তার কাছে আমি কোনো কথাই ভাঙিনি, তবু অ্যাটনিরা তো নির্বোধ জীব নয়, সে বোধহয় একটা কিছু সন্দেহ করেছিল। সেই সন্দেহই হল তার কাল। সমস্ত বন্দোবস্ত যখন পাকা হয়ে গেল, তাকেও দিলুম আমি প্রাণদণ্ড। কেমন করে, এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। তবে হারাধনের দ্বীপে আসবার আগেই তার মুখ আমি চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোক আর কেউ নেই।

হারাধনের দ্বীপ হচ্ছে আমার নিখুঁত অপরাধের পক্ষে আদর্শ স্থান। বাড়িঘর সবই সাজানো-গুছানো ছিল, সেই অবস্থাতেই তিন মাসের জন্যে দ্বীপটা আমি বেনামে ভাড়া নিয়েছি। বিজন বোসের সাহায্যেই অতিথি অভ্যর্থনা করবার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছিলুম।

নিজেকেও অতিথি সেজে এখানে আসতে হবে, অতএব সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে মাঝখানে খাড়া করলুম চারুশীলা দেবীকে। তিনি কাল্পনিক লোক নন। সত্য সত্যই আট-দশ বছর আগে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি পরলোকে! তার নামে একখানা চিঠি লিখে নিজের সঙ্গে রাখলুম— যেন এই দ্বীপটা কিনে তিনিই আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এই মিথ্যাটাকে সত্যের মতো সহজ করে আনবার জন্যে মনে মনে বারবার এই কথা নিয়েই আলোচনা করতে লাগলুম এবং দ্বীপের অন্যান্য আগন্তুকদেরও কাছে সেই চিঠিখানা বার করে দেখাতে ছাড়লুম না। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছিল আমার কথা।

অতঃপর আমার এই নিখুঁত অপরাধের কাহিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বলবার দরকার নেই। মনোতোষের গেলাসে সকলের অগোচরে সায়ানাইড

মিশিয়ে দিয়েছিলুম আমিই। আমার কাছে আর-একটা জিনিসও ছিল—যা অল্পমাত্রায় ঔষধ আর বেশিমাত্রায় বিষ। 'ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট'। ঘুমোবার ঔষধরূপে এটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু মাত্রাধিক্য হলেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। ডাক্তারও সত্যবালাকে একটা ঘুমোবার ওষুধ দিয়েছিলেন। সেটা কি তা আমি জানি না, কিন্তু সত্যবালার ওষুধের গেলাসে সেই সঙ্গে ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট মিশিয়ে দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয়নি। মেজর সেন মারা পড়েছেন বিনা যন্ত্রণায়। আমি যখন পা টিপে টিপে তার পিছনে গিয়ে দাড়াই তখন তিনি কিছুই টের পাননি। আমার হাতে ছিল একটা লোহার ডান্ডা। এক আঘাতেই তার মৃত্যু হয়।

এমন সাবধানে আমি কাজ করে গিয়েছি, কেউ আমরা উপরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি। ডাক্তার বোস বরাবরই সন্দেহ করে এসেছেন অমলেন্দুকে। তাঁর সেই সন্দেহকে দৃঢ়মূল করে তোলবার জন্যে আমিও কোনো যুক্তির আশ্রয় নিতে ছাড়িনি।

সর্বশেষ

‘জলপরি’ জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ভাসমান এক বোতলের ভিতরে যে বিবরণী পেয়ে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তারই বাকি অংশ। অবশেষে কৌশলে ডাক্তারকেও আমি আমার পক্ষে টেনে নিলুম। তাকে বললুম, এইবার আমি নিজের মৃত্যুর ভান করে আসল হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে চাই।

প্রথমে তিনি আমার কথার অর্থ ধরতে পারেননি। তারপর আমি তাকে ভালো করে সব কথা বুঝিয়ে দিলুম। সকলে জানবে যে কেউ গুলি করে আমাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু আসলে আমি বেঁচে থেকেই প্রকৃত হত্যাকারীর কার্যকলাপের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখব।

তারপর ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল যথেষ্ট থিয়েটারি—যদিও সেটা হচ্ছে আমার খামখেয়াল মাত্র। লাল পর্দাটা মুড়ি দিয়ে আমি সোফার উপরে গিয়ে বসলুম। ডাক্তার আমার কপালের উপরে এঁকে দিলেন একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। আমার মাথায় পরানো রইল একটা সাদা রঙের পশমি পরচুলা।

আর সকলের মতো ডাক্তারও প্রাণের ভয়ে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করছিলেন। আমার প্রস্তাবটা তাঁর খুব মনে লেগে গেল। আমার কথামতো কাজ করতে তিনি একটুও নারাজ হলেন না।

আমার তথাকথিত মৃত্যু'-র পরে আমার দেহটাকে উপরের ঘরে তুলে রেখে আসা হল। আমি বেশ জানতুম, মানুষ মৃতদেহকে—বিশেষত নিহত মানুষের দেহকে যথেষ্ট অপার্থিব বলে মনে করে। আমার মৃত্যুর পরেও আমার দেহকে আবার পরীক্ষা করবার জন্যে কেউ যে আর উপরকার ঘরে ঢুকতে চাইবে না, এটাও আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলুম।

কিন্তু মৃত্যুর আগেই আমি নিত্যানন্দ ও সৌদামিনীকেও পরলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। নিত্যানন্দ মারা পড়ে মেজর সেনেরই মতন। সে

কাঠ কাটছিল, আমি পিছন দিক থেকে ভোজালি দিয়ে তাকে আঘাত করি। কিন্তু সৌদামিনীকে হত্যা করবার জন্যে আমাকে কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমে খাবার ঘরে তারও চায়ের পেয়ালায় আমি মিশিয়ে দিই ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট'। চা-পানের পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে চেয়ারের উপরে বসিয়ে রেখে সকলে যখন বৈঠকখানায় গেল, তখন সর্বশেষে ছিলুম আমি। তারপর তিনি যখন কতকটা চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন, সেই সময়ে এক মুহুর্তের মধ্যেই হাইপোডামিক সিরিঞ্জে'র সাহায্যে তার দেহের মধ্যে সায়ানাইডের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে সে ঘর থেকে আমি চলে আসি।

মৃত্যুর পরেই আমি স্থির করলুম, এইবার ডাক্তারকেও পথ থেকে সরাবার সময় এসেছে। ডাক্তারকে বললুম, রাত্রে চুপি চুপি তার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে। দ্বীপের যেদিকে নদীর মোহনা, তিনি যেন সেইদিকে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। কিছু সন্দেহ না করেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। যথাসময়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হল। তাকে নিয়ে আমি জলের ধারে একটা উচ্চভূমির উপরে গিয়ে উঠলুম।

আমি জানতুম, জল সেখানে খুব গভীর। কথা কইতে কইতে হঠাৎ আমি তাকে বললুম, দেখুন ডাক্তার বোস, নীচে একখানা নৌকো বাধা রয়েছে না? শুনেই তিনি আগ্রহভরে জলের ধারে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর আমার হাত থেকে আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে ঝুপ করে তিনি পড়ে গেলেন একেবারে জলের ভিতরে। আমি জানতুম তিনি সাঁতার কাটতে পারেন না।

মহেন্দ্রকে কীভাবে হত্যা করেছি সেটা বোধহয় আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। তারপর মারা পড়ে অমলেন্দু—যদিও আমার হাতে তাকে মরতে হয়নি। স্বপ্নার রিভলভারের গুলিতে কেমন করে সে মারা পড়ে, উপরের ঘর থেকেই সে দৃশ্যটা আমি দেখতে পেয়েছিলুম।

স্বপ্না উত্তেজিতভাবে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে আসে। তারপর উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে বসে পড়ে। সেই সময় পিছন দিক থেকে গিয়ে আমি তার গলা টিপে ধরি।

তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসেই আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার রক্তের চাপ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হল, পাছে এই বিয়োগান্ত নাটকের চরম দৃশ্যটা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠবার আগেই মারা পড়ি, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি লিখে ফেললুম আমার এই কাহিনি।

কাগজখানাকে বোতলে পুরে ছিপি এঁটে জলে ফেলে দিতেও দেরি করলুম না। কিন্তু তার আগেও আরও যা করেছিলুম, আমার কাহিনির মধ্যে সে কথাও বলে রাখতে আমি ভুলিনি। নিখুঁত অপরাধের পালা চুকিয়ে, শয্যায় আশ্রয় নিয়ে আমিও পান করব পোটাসিয়াম সায়ানাইড'। হৃদরোগে নয়, রক্তের চাপে নয়, ইহলোক ত্যাগ করবার পথ খুঁজে নিই আমিই স্বয়ং!